স্বস্তিকা

৬৫ বর্ষ, ১২ সংখ্যা।। ১২ নভেম্বর - ২০১২।। ২৬ কার্তিক - ১৪১৯ ।। দীপাবলী সংখ্যা।। দাম : সাত টাকা

১৭৫তম জন্মবর্ষে
ব্রহ্মানন্দ
কেশবচন্দ্র সেন

নাগপুরে বিজয়া দশমী উপলক্ষে সরসঙ্ঘচালক
মোহনরাও ভাগবত ও দয়ানন্দ সরস্বতী

শুভ দীপাবলীর প্রীতি-শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা..

Murlidhar Ratanlal Export Limited

জীবনের প্রতি পদে
থাকে যদি ডাটা
জমে যায়
রান্নাটা
DUTA
Chicken Matton
Sabji Mix
Kashmiri MIRCH POWDER
SUPER Cumin Powder
SUPER Turmeric Powder
Chilli Powder
SUPER Coriander Powder
BLACK Pepper powder
ডাটা
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্মী) প্রাঃ লিঃ

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৭

সরকারি বয়ান 'মিসিং পপুলেশন' : হিন্দুর সংখ্যা উদ্বিগ্নজনকভাবে কমছে বাংলাদেশে □ ৯

রাজ্য রাজনীতিতে টালমাটাল পরিস্থিতির জন্য দায়ী কে? □ ১০

কে জানে কালী কেমন : কৈবল্য ও কামনাপ্রদায়িনী কালী □ ডঃ সুখেন্দু কুমার বাউর □ ১১

হাওড়ার হাজার-হাত কালী □ উজ্জ্বলকুমার মণ্ডল □ ১৩

অনুপ্রবেশ নিয়ে অধিকাংশ রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের নীতি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী □ মোহনরাও ভাগবত □ ১৪

১৭৫তম জন্মবর্ষের মূল্যায়নে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন □ প্রীতিমাধব রায় □ ১৮

কেশব সেন কালী মেনেছিলেন? □ অর্ণব নাগ □ ২৫

মহীয়সী কেশব জননী সারদাসুন্দরী দেবী □ ইন্দিরা রায় □ ২৮

খোলা চিঠি : ফোঁটা এবার ফেসবুকে □ সুন্দর মৌলিক □ ৩৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৩৭-৩৮

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ২৯ □ □ ভাবনা-চিন্তা : ৩১ □ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩২-৩৩

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৫ বর্ষ ১২ সংখ্যা, ২৬ কার্তিক, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ১২ নভেম্বর - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভ বিজয়া দশমী ও দীপাবলীর শুভেচ্ছা

শুভ বিজয়া দশমী ও দীপাবলী উপলক্ষে স্বস্তিকা-র সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক, এজেন্ট, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। — *স্বস্তিকা পরিবার*

নেত্রদান মহাদান

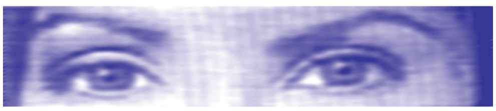

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

Design's For Modern Living

Neycer

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

Sales Office : 15, College Street, Kolkata-700012
Ph : 2241-7149 / 8174, 2237-1521
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

ALWAYS EXCLUSIVE

Vandana

SAREES

Cotton Printed Sarees

Contact - 2218 8744 / 1386

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

HB

INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

HB AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

NATIONAL PIPE &
SANITARY STORES

54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174

Sister Concern

Partha Sarathi
Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

PIONEER

লিখুঁত লেখার খাতা

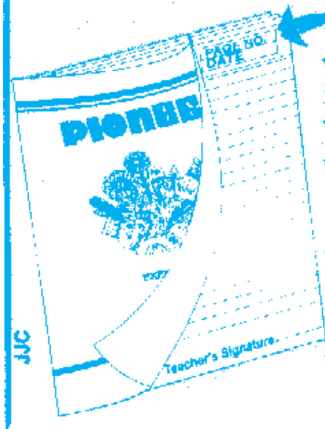

প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।

পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।

আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।

ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।

প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।

ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।

প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature........................ কলাম।

PIONEER PAPER CO.
Off: 4a, Jackson Lane (1st floor)
Kolkata-1. Ph:350-4152, 353-0546
Fax:91-33-353-2596.
E-Mail:pioneer3@vsnl.net

PIONEER

সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

দীপাবলীর শুভেচ্ছা
সহ—

—জনৈক শুভানুধ্যায়ী

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

দীপাবলীর অন্ধকার

এই দীপাবলী উৎসবের সময়ে দেশের যে কোনও প্রান্তেই ভারতীয়রা, তাদের আর্থিক অবস্থান যেমনই হোক না কেন, সকলের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করিয়া লইবার জন্য কিছু না কিছু খরচ করিয়া থাকে। দেশ যে আর্থিক সম্পদে সম্পন্ন হইয়াছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে এই সম্পদ কিছু মানুষের হাতেই সীমাবদ্ধ। ইহার ফলে একদিকে যেমন ধনী ও উচ্চ মধ্যবিত্তদের আর্থিক সমৃদ্ধি দ্রুত গতিতে হইতেছে, অন্যদিকে দরিদ্র ও সাধারণ মানুষের অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। কিছুদিন আগে যোজনা কমিশন দারিদ্র্য সীমারেখা হিসাবে যাহা চিহ্নিত করিয়াছে, তাহাতে সারাদেশ চমকাইয়া উঠিয়াছে। গত দেড়-দুই শতকে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান যেভাবে প্রসারিত হইতেছে, তাহার কারণ গরীবরা আরও গরীব হইতেছে। ইহা আজ আর কোনও গোপনীয় বিষয় নয় যে আমাদের দেশে কোটিপতির সংখ্যা এবং তাহাদের সম্পদ ক্রমশ স্ফীত হইতেছে। বস্তুত গত কয়েক দশক আগে বিশেষত নতুন আর্থিক উদারীকরণের পর যেভাবে আর্থিক বৈষম্য সৃষ্টি হইয়াছে, সেই কারণে দারিদ্র্যের রূপটি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

ঘটনা হইল, সত্তর ও আশির দশকের প্রথমার্ধে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে এতটা বৈষম্য দেখা যায় নাই, যাহা আজ লক্ষ্য করা যাইতেছে। ইহার একটি বড় কারণ হইল, গত দেড় দুই দশকে পরম্পরাগত ধনী ব্যক্তিদের ছাড়াও আর্থিক সংস্কারের সুযোগ লইয়া এক নতুন ধনিক শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে যাহাদের সম্পদ এবং সেইসঙ্গে ইহার প্রদর্শন দরিদ্র মানুষদের বঞ্চনাকে আরও অনাবৃত করিয়াছে। সত্য হইল গত এক দশকে ধনীদের ধনের অহঙ্কার আজ এতটাই চরমে পৌঁছাইয়াছে যে তাহা দরিদ্র মানুষের কাছে অমানবিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

দেশের যে কোনও মহানগর বা শহরে তৈরি মল-এ গেলেই ইহা প্রত্যক্ষ করা যাইবে। দেশ-বিদেশের নামীদামী ব্র্যাণ্ডের বিভিন্ন রকমের চোখ-ধাঁধানো ভোগ্যপণ্য থরে থরে সাজানো রহিয়াছে। যে দেশে ৭৮ শতাংশ মানুষের রোজকার আয় ২০ টাকা এবং দারিদ্র্যের কষাঘাত করিয়া তাহারা কোনও রকমে বাঁচিয়া আছে, সেই দেশে ধনীদের সম্পদের এই প্রদর্শন মরার ওপর খাঁড়ার ঘা ছাড়া আর কী বলা যায়? অতি সম্পদশালী এমন ১০ শতাংশ মানুষ এই দেশের মোট ভোগ্যপণ্যের ৩১ শতাংশ উপভোগ করিয়া থাকে। সরকারের আর্থিক নীতিই এইজন্য দায়ী। আর্থিক বিকাশ হওয়া সত্ত্বেও দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে নাই। বরং তাহা কমিয়াছে। দেশের মোট শ্রমশক্তির ৯২ শতাংশ অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করিতে বাধ্য হইতেছে। শুধু তাই নয়, এই কারণে সিইও থেকে সরকারি চাকুরীজীবীর মাহিনা কয়েক গুণ বাড়িলেও ন্যূনতম মজুরির তেমন কোনও বৃদ্ধি হয় নাই। এইসব কারণেই আমাদের দেশে আজ ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিশাল ব্যবধান। ইহা দীপাবলীর অন্ধকার দিক্। এখনই এই অন্ধকার দূরীভূত করিবার উদ্যোগ না লইলে ভবিষ্যতে বিস্ফোরণ ঘটিতে পারে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

আমাদের এই জগৎ শ্রমবিভাগের নিয়মে পরিকল্পিত। একজন মানুষই সব কিছুর অধিকারী হইবে—এ কথা বলা অর্থহীন। কোন একটি জাতিই যে সকল বিষয়ের অধিকারী হইবে—এরূপ ভাবা আরও ভুল। তথাপি আমরা কি ছেলেমানুষ? অজ্ঞতাবশতঃ শিশু ভাবিয়া থাকে যে, সমগ্র জগতে তাহার পুতুলের মতো কাম্য আর কিছুই নাই। যে-জাতি জড়শক্তিতে বড়, সে ভাবে জড়বস্তুই একমাত্র কাম্য, উন্নতি বা সভ্যতা বলিতে জড়শক্তির অধিকারই বুঝায়; আর যদি এমন কোন জাতি থাকে, যাহাদের ওই শক্তি নাই বা যাহারা ওই শক্তি চাহে না, তাহারা নগণ্য—তাহারা বাঁচিয়া থাকার অযোগ্য, তাহাদের সমগ্র অস্তিত্বই নিরর্থক। অন্যদিকে আর একজাতি ভাবিতে পারে, কেবল জড়বাদী সভ্যতা সম্পূর্ণ নিরর্থক। প্রাচ্যদেশ হইতে উত্থিত বাণী একদা সমগ্র জগৎকে বলিয়াছিল : যদি কোনও ব্যক্তি বিশ্বের সব কিছু অধিকার করে অথচ তাহার আধ্যাত্মিকতা না থাকে, তবে তাহাতে কি সার্থকতা? ইহাই প্রাচ্য ভাব, অপরটি পাশ্চাত্য।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

With Best Compliments From :-

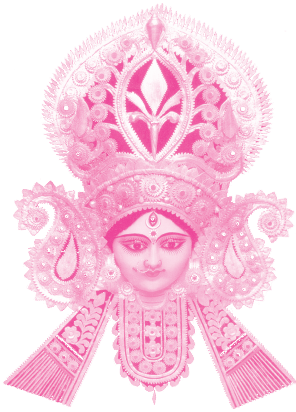

An ISO 9001 : 2008
certified Company

SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED

FOR ANY TYPE OF PILE FOUNDATION WORK
Cast-in-Situ Driven, Cast-in-Situ Bored, Precast Driven, Precast

AND
All Types of Engineering and Construction Works for
Civil, Structural, Marine, Tankages, Piping
Equipment Erection In

Regd. Office
"Simplex House"
27, Shakespeare Sarani, Kolkata-17
Phone (033) 2301 1600
Fax : (033) 2283 5964/65/66
E-mail : simplexkolkata@simplexinfra.net
Web. : www.simplexinfrastructures.com

Adm. Office
12/1, Nellie Sengupta Sarani
Kolkata - 700 087
Phone (033) 2252 8371/8373/8374
Fax : (033) 2252 7595

BRANCHES

NEW DELHI MUMBAI CHENNAI

OVERSEAS BRANCHES

QATAR DUBAI BAHRAIN

সরকারি বয়ান 'মিসিং পপুলেশন'

হিন্দুর সংখ্যা উদ্বিগ্নজনকভাবে কমছে বাংলাদেশে

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের চেন্নাই বৈঠকে এবার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। বন্যার স্রোতের মতো চোরা পথে বাংলাদেশের মুসলিম নাগরিকরা অসম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদিন ঢুকছে। এর প্রধান দুটি কারণ। প্রথম কারণ, ভারত-বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের ৮০ শতাংশ এলাকা অরক্ষিত, খোলা। দ্বিতীয় কারণ, সীমান্ত লাগোয়া তিনটি রাজ্যের ক্ষমতাসীন শাসক দল বা জোট মুসলিম ভোটের লোভে অনুপ্রবেশকারী কয়েক কোটি বাংলাদেশী পরিবারকে রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, জব কার্ড ইত্যাদি দরাজ হাতে বিলিয়েছে। সরকারি জমি জবরদখল করে তারা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। অসমে জাতিদাঙ্গার প্রধান কারণ, সেখানের ট্রাইবাল ল্যান্ড জবরদখল করা। হাজার বছর ধরে বাস করা স্থানীয় ভূমিপুত্রদের ঘরছাড়া করা। আদিবাসী মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারটুকু কেড়ে নেওয়া। এবার অসমের মানুষকে যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, অচিরেই পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরাকে সেই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হবে। সঙ্ঘ মনোভাবাপন্ন সংগঠনগুলি ছাড়া দ্বিতীয় কাউকে এমন একটা বিপদ নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখছি না। অথচ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের জন্যই ভারতের অর্থনীতি, নিরাপত্তা আজ বিপন্ন। এর ঠিক বিপরীত চিত্র সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে বাংলাদেশের সরকারি জনগণনা থেকে। প্রতিবেশী এই রাষ্ট্রের ২০১১-এর সুমারি রিপোর্ট বলছে বাংলাদেশের হিন্দু জনসংখ্যা দ্রুত কমছে। ১৯৫১ সালে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুর সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশ। দেশভাগের ঠিক আগে পূর্ববঙ্গে বাস করতেন জনসংখ্যার ২৮ ভাগ। ২০১১ সালে তা নেমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৮.৫ শতাংশে। অন্যদিকে, বাংলাদেশে মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার অস্বাভাবিকভাবে বেশি। কারণ, ইসলামে জন্মনিয়ন্ত্রণ 'গুণাহ' মানে পাপ। দেশভাগের পর ১৯৫১ সালে প্রথম আদমসুমারিতে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে (অধুনা বাংলাদেশ) মুসলিম জনসংখ্যার হার ছিল ৭৫.৯ শতাংশ। ২০১১ সালে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯০.৪ শতাংশ। বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্যা কমছে কেন? সেখানের সরকারি আধিকারিকরা বলছেন, ১৯৫১—২০১১-র মধ্যে মোট ১১টি সুমারি হয়েছে। এই

গূঢ়পুরুষের

কলম

জনসুমারির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে হিন্দুর সংখ্যা কমেছে ২৪ শতাংশ। অর্থাৎ, বছরে প্রায় ১ লক্ষ হিন্দুর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সরকারিভাবে বলা হয়েছে এঁরা 'হারিয়ে যাওয়া মানুষ'। (মিসিং পপুলেশন)। বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যার একটা বড় অংশ কীভাবে হারিয়ে যাচ্ছে তার কোনও তথ্যই সেখানের সরকারের কাছে নেই। অথবা থাকলেও বাংলাদেশ সরকার বলতে চায় না। বাস্তব ঘটনা হচ্ছে, সেখানে রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক হিংসার কারণে হিন্দুরা গোপনে বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। এই কারণেই, বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্যা দ্রুত কমছে। এই কারণেই, বাস্তব ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে বাংলাদেশের জনসুমারি আধিকারিকরা বলছেন, এঁরা দলে দলে হারিয়ে যাচ্ছেন। 'দে আর জাস্ট মিসিং পপুলেশন'। চমৎকার কথা। একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের জনসংখ্যার বড় একটা অংশ নিয়মিতভাবে হারিয়ে যাচ্ছে, অথচ সরকারের হেলদোল নেই। তদন্ত হয় না। তবে এমন জনসুমারির প্রয়োজনটাই বা কী।

বাংলাদেশ সরকার হিন্দু জনসংখ্যা কমালে 'মিসিং পপুলেশন' বলে ব্যাখ্যা করলেও সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার আদায়ের কাজ করা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পপুলেশন রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, হিন্দুদের সম্পত্তি লুঠ, দৈহিক নির্যাতন, ধর্ষণ, খুন ইত্যাদি অপরাধের জন্য হিন্দুরা গোপনে বাংলাদেশ ছাড়ছেন। সম্প্রতি চট্টগ্রামের হাটহাজারী, সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ, কুড়িগ্রামের চিরিরবন্দরে জামায়েত ধর্মীয় জিগির তুলে হিন্দু মন্দিরও সম্প্রতি লুঠপাট করে। হিন্দুদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় পুলিশ ও প্রশাসন পাশে দাঁড়ায়নি। আজও সেখানে মুসলিমদের ধারণা, হিন্দু পরিবারের সম্পত্তি মানে শত্রু সম্পত্তি। এর মূল কারণ, বাংলাদেশের শত্রু সম্পত্তি আইন। মনে রাখতে হবে দেশভাগের আগে পূর্ববঙ্গে ৪৫ ভাগ জমির মালিক ছিলেন হিন্দুরা। দেশভাগের পর শত্রু সম্পত্তি আইনে সেই জমি গ্রাস করা হয়। বাংলাদেশে ২০০১---২০১১ সালের জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। যেমন, বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, ফিরোজপুর, পটুয়াখালি ও বরগুনা এই ছয়টি জেলায় ২০০১ সালের সুমারির হিসাবে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ১৬ হাজার ৬১ জন। ২০১১ সালে সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৭ লক্ষ ৬১ হাজার। একইভাবে একদা হিন্দুবহুল জেলা গোপালগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ঠাকুরগাঁও, খুলনা, দিনাজপুর ও বাগেরহাটে হিন্দু জনসংখ্যার হ্রাস চোখে পড়ার মতো। এই বিভাগে একমাত্র নড়াইলে হিন্দুর সংখ্যা কমেনি। অথচ বাংলাদেশের হিন্দু জনবহুল এলাকা গোপালগঞ্জ জেলাতেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাড়ি। এখানে আওয়ামি লিগেরই একচ্ছত্র আধিপত্য। অথচ গত ১০ বছরে এই জেলা থেকে প্রায় ২০ হাজার হিন্দু কমেছে। সরকারিভাবে এঁরা 'মিসিং পপুলেশন'। প্রচার আছে, আওয়ামি লিগ হিন্দুদের বন্ধু। অথচ গোপালগঞ্জে জেলা আওয়ামি লিগে আজ পর্যন্ত কোনও হিন্দু নেতা লিগের জেলা সভাপতি বা সম্পাদক হননি। এরপরেও বলতে হবে আওয়ামি লিগ হিন্দুর স্বার্থরক্ষাকারী দল?

রাজ্য রাজনীতিতে টালমাটাল পরিস্থিতির জন্য দায়ী কে?

নিশাকর সোম

সম্প্রতি শাসকদলের ইউপিএ সরকার ছেড়ে আসা নিয়ে এ-রাজ্যে এক জটিল সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। চলছে 'ইগো'-র লড়াই এবং রাজনৈতিক আত্মম্ভরিতা ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হচ্ছে, উলুখাগড়ার প্রাণ যাচ্ছে। মারা পড়ছেন নিরীহ রাজ্যবাসী।

এরাজ্য সিপিএম এখনও পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়াই করার মতো শক্তি সঞ্চয় করে উঠতে পারেনি। এর কারণ হলো— চমক দেওয়া বা গিমিক-স্ট্যান্ট-এর কার্যকলাপে অভ্যস্ত রাজ্য-সিপিএম পুরানো রেশ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। একটি মিছিল, একটি জনসভার সাফল্য দেখেই সিপিএমের নেতা-কর্মীদের মধ্যে 'যুদ্ধ জয়'-এর মনোভাব দেখা দিয়েছে। তাদের মনোভাব— জনগণ (গ্রামাঞ্চলসহ) মমতার সরকার সম্পর্কে 'সম্পূর্ণরূপে' আস্থা হারিয়েছেন। এই মনোভাবকে সিপিএমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব 'ভুল' বলেছেন।

সিপিএমের সাধারণ-সম্পাদক প্রকাশ কারাট রাজ্যের পার্টি নেতৃত্বকে রাজনৈতিক ক্লাস করে ভুল মনোভাব সংশোধন করার কথা বলেছেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন সিপিএমের বিগত কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য-সম্পাদক বিমান বসুর রিপোর্টে বলা হয়েছে— (১) পার্টির নীচের তলার স্থবিরত্ব, (২) ভীতি, (৩) কি করে শোধ-নেওয়া যায় তার চিন্তা, (৪) সুবিধা ভোগের জন্য নীচের তলার কর্মীদের তৃণমূলে চলে যাওয়া।

অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলছুটদের জন্য পারিতোষিকের ইঙ্গিত দিয়ে চলেছেন। তাঁর লক্ষ্য মূলতঃ অধীর চৌধুরী এবং দীপা দাসমুন্সী-কে বিচ্ছিন্ন করা। তাই কংগ্রেস-বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু তৃণমূলে যোগ দিয়ে রাজ্যমন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়ার ব্যবস্থা পাকা করেছেন। শোনা যাচ্ছে যে ক্ষুব্ধ মানস ভুঁইয়াও নাকি ক্ষমতার অঙ্গনে প্রবেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন।

বিজয়ী শিবিরের অবস্থাও খুব সুখকর নয়। প্রথমত, কংগ্রেসের সঙ্গে জোট ভাঙা হলো। ইউপিএ থেকে সরে যাওয়া এবং যুদ্ধকালীন বিরোধিতার পথে মমতার যুদ্ধং দেহি মনোভাব। ইউপিএ তথা কংগ্রেস সম্পর্কে মমতার মন্তব্য— 'কেন্দ্রীয় সরকার একটা পচাগলা মৃতদেহ। কাঁধ দেওয়ারও লোক নেই। এটাকে শ্মশানে দাহ করবে না কবর দেবে সেটা কংগ্রেসের বিবেচনার বিষয়। কংগ্রেস এখন ক্ষয়িষ্ণু শক্তি।' মমতার আরও বক্তব্য হলো— 'সিবিআই এখন কংগ্রেস ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন!' মনে পড়ে যায় বুদ্ধদেব-এর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই মমতাই প্রায় প্রত্যহই সিবিআই তদন্তের দাবি করতেন।

এই সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্যর বক্তব্য হলো— 'রাজ্যে ফ্যাসিস্ট সরকার চলছে। কেন্দ্রীয় সরকার নয়, রাজ্য সরকারই মরে গেছে। হলদিয়া ইস্যুতে

রাজ্য-সরকার আই সি সি ইউ-তে চলে গেছে। হলদিয়ার ঘটনা রাজ্যের একটা দূষিত ঘা-তে পরিণত হয়েছে। হলদিয়ার ঘটনা প্রমাণ করে দিল তৃণমূলের আশীর্বাদ ছাড়া কোনও সংস্থা এই রাজ্যে ব্যবসা করতে পারবে না।'

হলদিয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন 'সব স্বাভাবিক। কিছু সাংবাদিক সংবাদপত্র সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করছে। সাংবাদিক কাউনসেলিং করা দরকার। পেইড নিউজ...' উল্লেখ করা প্রয়োজন, পূজা উপলক্ষে সাংবাদিকদের ১৬০০ টাকার পোশাক গিফট (?) মমতা দিয়েছেন। দুটি সংবাদপত্রের সাংবাদিক এটা গ্রহণ করেননি।

ইউপিএ সরকারের রদবদল সম্পর্কে রাজ্য-সরকারের সেল্‌ফ স্টাইল্ড মুখপাত্র তথা ২নং স্থানের জন্য আগ্রহী সুব্রত মুখার্জির বক্তব্য হলো--- 'কেন্দ্রীয় সরকারের রদবদল অসাংবিধানিক।' এদিকে কিন্তু রাজ্য- মন্ত্রীদের মাথায় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করাটা কি সাংবিধানিক? পশ্চিমবঙ্গে কখনই উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়নি। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সম্পর্কে তদানীন্তন মৎস্য-মন্ত্রী হেমচন্দ্র নস্কর বলেছিলেন--- 'আমরা কচ্ছপমন্ত্রী'। মহাকরণে আসার পর ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় উল্টে দেন— আমরা সারাদিন হাত-পা ছুঁড়ি, তারপর ৫টা বাজলে সোজা করে দিলে আমরা বাড়ি চলে যাই।' অবশ্য সংবাদপত্রে হেমচন্দ্র নস্করের উক্তি প্রকাশ হলে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁকে একথা বলেছিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করলে হেমদা স্বীকার করেছিলেন। বিধানবাবু হেসেছিলেন।

বর্তমান রাজ্য-মুখ্যমন্ত্রী কি ডাঃ বিধানচন্দ্রের পথে চলেন? তিনি কি বিধানবাবুর মতো প্রাজ্ঞ নেতা? এদিকে কিন্তু রাজ্যমন্ত্রিসভা তৃণমূলের অভ্যন্তরে ক্ষোভের তুষের আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলছে। রাজ্য মন্ত্রিসভায় কোনও টিম গড়ে ওঠেনি। ইতিমধ্যে মন্ত্রী সুলতান সিং, কৃষিবিপণন মন্ত্রী অরূপ রায়ের বিরুদ্ধে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার অভিযোগ উঠেছে। কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি হিসাবে আরাবুলের নিয়োগ নিয়ে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের তো প্রথাগত কোনও শিক্ষা ছিল না— তিনি তো শান্তিনিকেতন করেছিলেন'। রবীন্দ্রনাথ আরাবুল সমগোত্রীয়?

রাজ্যের প্রশাসনে একটি নতুন ঘটনা দেখা যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর সেক্রেটারিয়েট থেকে টুকটুক কুমারকে সল্টলেকে বদলি করে দেওয়া হয়েছে। জনশ্রুতি, টুকটুক কুমারকে নাকি নারী ও সমাজ-কল্যাণ দফতরের বিভিন্ন হোমগুলির কাজে ব্যবহার্য সামগ্রী কেনার তালিকা থেকে কিছু কনট্রাক্টরের নাম বাদ দেওয়ার দরুন সরানো হলো।

টুকটুক কুমারের স্থলে গৌতম সান্যাল হলেন মুখ্যমন্ত্রীর সেক্রেটারি। কে এই গৌতম সান্যাল? মমতা যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন তখন এই গৌতম সান্যাল তদানীন্তন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন, মহাকরণে মহারব যে মুখ্যমন্ত্রীর ফাইল পড়ে বিষয়বস্তু পড়ে নোট দেওয়ার অভ্যাস নেই। এই গৌতম সান্যাল এখন ফাইল পড়ে নোট লেখেন।

এদেশে এবং রাজ্যে এখন রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য অতীতের নানা ঘটনা নিয়ে তদন্ত করার আদেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যেমন, দীপা দাসমুন্সির ঘনিষ্ঠ নাট্যকর্মীর নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার মামলা, অধীর চৌধরীর বিরুদ্ধে খুনের মামলা, বিরোধী নেতা সূর্যকান্ত মিশ্রের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ।

কে জানে কালী কেমন
কৈবল্য ও কামনা প্রদায়িনী কালী

ড. সুখেন্দু কুমার বাউর

।। ১।।

'কে জানে কালী কেমন, ষড়দরশনে না পায় দরশন।'

কালী বা কালিকা দেবী ঈশ্বরের মাতৃশক্তির সর্বোত্তম প্রকাশ। বেদের রাত্রিসূক্তকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে যে রাত্রিদেবীর ধারণা গড়ে ওঠে, তিনিই কালিকাদেবী হিসাবে করেন আত্মপ্রকাশ। বেদের নির্ঋতি দেবী থেকে কালিকা দেবী আবির্ভূত হয়েছেন, বলে অনেক পণ্ডিতের বিশ্বাস। শতপথ ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে নির্ঋত দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে দেবীকে 'কৃষ্ণা' ও ঘোরা বলা হয়েছে। যেমন 'কৃষ্ণা বৈ নির্ঋতি 'ঘোরা বৈ নির্ঋিতি। এই নির্ঋতি দেবী পাশহস্তা। 'পাশ' থেকে ত্রাণ পাওয়ার প্রার্থনা জানানো হয়েছে। তবে পরবর্তীকালে এই নির্ঋতি দেবী বিস্তৃতি পাননি, তবে ইনিই যে বিবর্তিত রূপে কালী তার পেছনে জোরালো সমর্থন নেই।

মুণ্ডক উপনিষদে পাই 'কালী'র ও 'করালী'র উল্লেখ। যজ্ঞাগ্নির সপ্ত জিহ্বার একটি 'জিহ্বা'র নাম কালী যেমন 'কালী করালী চ মনোজবা চ'। তবে এখানে কালী আহুতি গ্রহণকারী অগ্নি জিহ্বা (flame) মাত্র। দার্শনিক মত অনুযায়ী পঞ্চইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মন— এই সাতটি হলো অগ্নির সপ্তজিহ্বা।

মহাভারতে 'কালী'— অশ্বত্থামা রাত্রিতে পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশের আগে যাঁকে পাহারা দিতে দেখেন— সেই কালীমূর্তি রক্তাস্য নয়না, রক্ত মাল্যানুলেপনা (লালফুল— জবা কি?) পাশহস্তা (নৈর্ঋতি দেবীর পাশহস্তার অনুরূপ?) ও ভয়ঙ্করী।

'হরিবংশে'— কালীকে শবর, বর্বর ও পুলিন্দদের দ্বারা পূজিত ও মদ্য মাংস প্রিয়া দেখতে পাই।

শুম্ভ নিশুম্ভের অনুচর চণ্ড, মুণ্ড অসুরদের সঙ্গে নিয়ে দেবী দুর্গার কাছে গেলে ক্রোধান্বিতা দেবীর মুখ কালো হয়ে গেল। তাঁর ভ্রূকুটিকুটিল ললাট হতে দ্রুত অসি পাশধারিণী করালবদনা কালী বিনিষ্ক্রান্তা হলেন। এই কালীর বর্ণনার সঙ্গে এখনকার মৃৎশিল্পে বর্ণিতা কালী মূর্তি মিলে যায়। দেবী চণ্ড ও মুণ্ডকে নিধন করেন বলে 'চামুণ্ডা' নামে কীর্তিতা। রক্তবীজদের বদন বিস্তার করে গ্রাস করেন বলে 'শোণিতবদনা'। চামুণ্ডা দ্বিভুজা মূর্তি।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে (মার্কণ্ডেয় পুরাণ অন্তর্গত) দেবী পার্বতীর শরীর কোষ থেকে কৌশিকী দেবী নিঃসৃতা দেবী পার্বতী নিজেই কৃষ্ণবর্ণা হন। তখন তিনি হিমাচলবাসিনী কালিকা নামে খ্যাত হন। তিনি অসুরবধের জন্য মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার সহায়িকা, সঙ্গিনী।

তবে দেখা গেল ইনি দেবী পার্বতী বা দুর্গা দেবীর প্রতিরূপা, তিনি অপর দুর্গা। যুদ্ধে অসুর নিধন করতে করতে দেবী এতই আত্মহারা হয়ে যান, যে সৃষ্টি ধ্বংসের উপক্রম হয়। তখন শিব সাময়িক উন্মত্তা দেবীর পায়ের কাছে শুয়ে পড়েন। তাঁর বুকের উপর পা পড়তেই দেবীর চৈতন্য হয়। তিনি লজ্জায় জিভ কাটেন।

কালীর বর্তমান রূপ, বাংলাদেশে এখন যা দেখতে পাই, তা রূপ দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, তন্ত্রাচার্য ও পণ্ডিত (১৬ শ শতাব্দী), 'তন্ত্রসার' প্রণেতা। স্বপ্নে মা কৃষ্ণানন্দকে আদেশ করেন, আমাকে মূর্তিতে প্রতিষ্ঠা কর। তখনও পর্যন্ত মায়ের কোনও রূপ ছিল না। কৃষ্ণানন্দ তখন স্বপ্নেই বলে ফেললেন 'কোন্‌রূপে মা তোমায় প্রতিষ্ঠা করবো। তখন মা বললেন 'আগামীকাল ভোরেই আমার রূপ দেখতে পাবি।' স্বপ্নে মা হলেন অন্তর্হিতা।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে কৃষ্ণানন্দ দেখলেন ঘুঁটে কুড়ানী এক কালো মেয়ে দেয়ালে দিচ্ছে ঘুঁটে। আলীয় ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে সেই মেয়ে— অর্থাৎ ডান পা এগিয়ে দিয়ে সামনের দিকে। ঢালুভঙ্গীতে দৃঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে আছে বাঁ পায়ের ওপরে। বাঁ হাতে একতাল গোবর। ডান হাতে ঘুঁটে তৈরীর মতো সামান্য একটু গোবর। কৃষ্ণানন্দকে দেখে নারীর সুলভ লজ্জায় জিভ কাটলো ওই মেয়েটি। লাল টকটকে জিভ বের করে তার উপর দেখা গেল তার সুবিন্যস্ত শুভ্র উর্ধ্বদণ্ড পাটি। কৃষ্ণানন্দ বিদ্যুৎচরিতের মতো অন্তরে সাড়া পেলেন। আগেকার দিনের ঋষিরা বেদ উপনিষদের সময় সরস্বতী নদীর তীরে ধ্যান করতে করতে মন্ত্র, দেব, দেবীদের সাক্ষাৎ পেতেন। তাঁরা হতেন মন্ত্রদ্রষ্টা। এবারে বাংলায় বোধন করলেন কালীর নবতন্ত্র ঋষি সাধকপ্রবর শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ।

কৃষ্ণানন্দ নিজের হাতে মাটির মূর্তি তৈরি করে পূজা করলেন।

নিত্যদিন তিনি এইভাবেই মা কালীর মৃন্ময়ী মূর্তির পূজা করতেন। গঙ্গামাটি দিয়ে তৈরি শিবলিঙ্গ— প্রতিদিন তৈরি করে যেমন নিত্য আরাধনা করা হয়, তেমনি এই কালীমূর্তিও নিত্যদিন পূজিত ও পরদিন বিসর্জিত হোত গঙ্গাবক্ষে।

পরে নবদ্বীপ রাজা নিজ ভবনে কার্তিক মাসে বিশাল মূর্তি তৈরি করে পূজা দিতেন। এই রূপে আসেন তিনি আজ বাঙালীর ঘরে ঘরে।

বাংলায় শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে তিনি আজ সর্বেশ্বরী সর্বমঙ্গলা হয়ে উঠলেন। এই জন্য বলা হয় 'কালিকা বঙ্গদেশে চ'।

।। ২।।

কালী পৃথিবীর আদি মাতৃশক্তির প্রতীক। এই কালীই কুণ্ডলিনী। মনীষী স্বাধীনতাসংগ্রামী বিখ্যাত বক্তা বিপিনচন্দ্র পাল 'Soul of India'-তে বলেছেন দেবী আদি নরগোষ্ঠীর বর্বর শক্তির প্রতীক।

সত্যিই কি তাই? দেবী নৃশংসা, নৃমুণ্ডমালিনী, বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী, করালিনী, কিন্তু সন্তানবরদা, কঠোরা কিন্তু ততোধিক কোমলা। 'মা মা' ডাকে, চোখের জলে, শরণাগতিতে সন্তুষ্টা হন। তিনি আমাদের সবার মা।

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে তিনি মৃত্যুরূপা কালী। 'কালী বক্তৃতা দেন ভগিনী নিবেদিতা। নেতাজী সুভাষচন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদ মাকালীর ভক্ত। কালীঘাটের কালী, বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনী। অযোধ্যা দেবী পাটন, হায়দ্রাবাদের শিবাজী পূজিত তুলজা ভবানী— এঁরা প্রসিদ্ধা কালী। আরও প্রসিদ্ধ বেলুচিস্তানের হিংলাজ কালী, মুসলমানদের বিবি নানী, ঋগ্বেদের ইনি নর্ণিয়া দেবী, সিরিয়া, মিশর, পারস্য, আর্মেনিয়ার ইনি অনইতি, অনিয়া, অনিতিশ, তনইস, ব্যাবিলনে ইনি 'ননা' দেবী।

মহাকবি কালিদাস কালীর দাস। মল্লিনাথ টীকাকার কালীর অর্থ করেছেন 'ঘটনাবলী'।

বাণভট্টের 'কাদম্বরী'তে ইনি চণ্ডী, বাক্‌পতিরাজে (৮ম শতাব্দী) দ্বারা বর্ণিত 'পর্ণশর্বরী', হলুদ পাতা দিয়ে ঢাকা কোমর শবরদের পূজিতা অর্থ কালী। ভবভূতির মালতীমাধব (৭ম শতাব্দী) বলিদানে পূজিতা ভয়ংকরী 'করালা' দেবীই কৃষ্ণবর্ণা উগ্রা চামুণ্ডা কালী।

কৃষ্ণাবর্ণা রাত্রি দেবী যিনি দেবী চণ্ডীর দেহ নিঃসৃতা— তিনি কৌশিকী, ব্রহ্মার কথায় দেবী বিন্ধ্যাচলে প্রতিষ্ঠিতা।

কালিকা পুরাণে কৌশিকীরূপে পার্বতীর দেহ হতে নিষ্ক্রান্তা দেবী কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে কালিকারূপ গ্রহণ করেন, ইনি কালরাত্রি (৫।২৩।৩)। কালী দশমহাবিদ্যার প্রথমা। আকাশ হলো দেশ ও কাল। কালী কাল শক্তি, তেমনি তারা দেশশক্তি। দেশ ও কালে যে বিভিন্নতা, কালী এবং তারাও সেই বিভিন্নতা। কালী ও তারা দুজনেই কাল ও দেশে আত্মশক্তিতে সংহারকারিণী। সাদা, হলুদ প্রভৃতি রং এক কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, তেমনই সমস্ত কালজ পদার্থ কালীতে ও সমস্ত দেশজ পদার্থ তারাতে বিলীন হয়। নির্গুণ নিরাকার বিশ্বকল্যাণী কালশক্তি কৃষ্ণবর্ণা ও দেশশক্তি নীলবর্ণা— এঁরা নিত্য অব্যয় ও কল্যাণময়ী। অকৃতত্ত্ব প্রযুক্ত বলে এঁদের ভালে বা ললাটে চন্দ্রকলা। দেশ ও কাল অনন্ত বলে এঁরা আবরণ শূন্যা।

হিন্দুতন্ত্রে কালী রমণী, তারা জননী। কালী আদ্যাশক্তি, মহাশূন্যতারূপী পুরুষ সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কে যুক্তা। সুতরাং তাঁর সঙ্গে পুরুষের যে ক্রিয়া তা রমণতুল্য। সেইজন্য কালী রমণী শিরোমণি। এই রমণ থেকে দেশের জন্ম। তাই দেশ নীলবর্ণা। এই নীলবর্ণা দেশে কালদ্বারা সৃষ্ট সৃষ্টি স্থানলাভ করেছে। জননী যেমন সন্তানকে বুকে করে থাকেন, তেমনি দেশরূপিণী তারা জগৎ ধারণ করে আছেন, তিনি তাই জননী মুখ্যা। তারা আবার বৌদ্ধ দেবীও।

ব্রহ্মরন্ধ্র পথে প্রাণশক্তির লীলা— তিনি হীঙ্ তিনি হিংলাজ কালী। লাস্যবিলাস বা অগ্নি ঋত ও ছন্দগতিপূর্ণ— অন্ধকার গহ্বরে এত বড় স্ফুরৎজ্যোতি কালী, সুমেরীয় ইন্নিনি, প্যালেস্টাইনে নীনা, ঋগ্বেদোক্ত— ননা। ব্যাবিলনের ইশতার অথর্ববেদের রণদেবী ইন্দ্রাণী। অনিৎদেবী কালীর মতোই— নরমুণ্ড গ্রন্থিত বস্ত্র পড়ে অট্টহাস্য করেন।

কালীর ত্রিকোণাকৃতি মুখ ব্রহ্মযোনির প্রতীক যা হতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আবির্ভূত। ভ্রূমধ্যস্থ ত্রিনয়ন Pineal Gland (পিনিয়াল গ্রন্থী)— যা দূরদৃষ্টি (clear divine vision) দেয়। দীর্ঘ বিলম্বিত জিহ্বা দাঁতকেটে খেচরী (মুদ্রারপ্রতীক)। চার হাতের ব্যাখ্যা— Black hole (কৃষ্ণগহ্বর) এর বিস্ফোরণের Symmetry breaking থেকে জাত চারটি শক্তি— Strong nuclear force, Electromagnetic force, gravity ও weak nuclear force।

গলার নরমুণ্ডমালা--- ৫১টি বিস্ফোরণজাত স্বতন্ত্র তরঙ্গ (individual wave)। হস্তধৃত মুণ্ডটি সৃষ্টির প্রতীক। কালী আদ্যাশক্তি (Premordial Energy) কালীর বীজমন্ত্র ক্রীং-ক্রীং (কামনা)— (ক) প্রাণাগ্নি শক্তি (র) + অগ্রগতি (ঈ)।

(কাল) ক, বহ্নি শব্দের 'র', রতি শব্দে 'ঈ' + তাতে বিন্দু (ঁ) যুক্ত ক্রীং।

ফট্ স্বাহা— ফট্ = সর্বাঙ্গে— অর্থাৎ সর্বাঙ্গে প্রণিপাত করি।

কালকে কলন করেন বা গ্রাস করেন বলে তিনি কালিকা। মার পায়ে কোটি কোটি প্রণতি। জয়মাতা কালিকা।

মা কালীকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। মা তারাকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন শ্রীশ্রী বামাক্ষেপা দেব। মা কালীকে মানতে বাধ্য হয়েছিলেন বেদান্তী ব্রহ্মজ্ঞানী তোতাপুরী। শেষ পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দও কালী মানেন। লেখেন 'মৃত্যুরূপা কালী' নামে তাঁর বিখ্যাত কবিতা— ভাবের ঘোরে লিখে অচৈতন্যবৎ হন।

কালী নাম কলিযুগে মহামন্ত্র, প্রত্যক্ষ সিদ্ধিপ্রদায়ক। জয় মাতা কালিকা। অভয়দায়িকা।

অখণ্ড ভারত গঠনে, হিন্দু জাগরণে ও ভারত জাগরণে শ্রীশ্রী দেবী কালিকার কাছে আমরা মহাশক্তি পেতে বিনম্রচিত্তে শরণাগতিতে প্রার্থনা করি আমরা সবাই। ''যতনে হৃদয়ে রাখো আদরিণী শ্যামা মাকে'।

হাওড়ার হাজার-হাত কালী

উজ্জ্বলকুমার মণ্ডল

প্রতি বছর কার্তিক মাসে দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালীপূজা উপলক্ষে সমগ্র বাংলা উৎসবে, আনন্দে মেতে ওঠে। দুর্গাপূজার পর কালীপূজা। যদিও এ শুধু রূপভেদ। কালী, দুর্গা সবই এক মহাশক্তি তথা আদ্যাশক্তিরই রূপ বিশেষ। পুরাণমতে, দক্ষরাজকন্যা সতী দক্ষ যজ্ঞে যেতে চাইলে মহাদেব আপত্তি করেন। সতী তখন কালীমূর্তি ধারণ করেন। তাতেও শিব অবিচল থাকায় মহামায়া দশ দিকে দশমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে শিবের গতি রুদ্ধ করে দেন। সদাশিব তখন মহামায়ার রূপ দেখে সম্মোহিত চিত্তে প্রশস্তি করেন :

ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী
ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা।
ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্‌দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া
সর্বশক্তিস্বরূপা ত্বং সর্বদেবময়ী তনুঃ।।

সাধারণত 'কালী' বলতেই আমাদের মানসচোখে ভেসে ওঠে :

করালবদনাং ঘোরাং
মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং
মুণ্ডমালা বিভুষিতাম্...

অর্থাৎ, দেবী করালবদনা, ভয়ঙ্করী, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, মুণ্ডমালা- বিভুষিতা, তাঁর বাম দিকের ঊর্ধ্ব হস্তে খড়্গ, নীচের হাতে নরমুণ্ড। দক্ষিণভাগে দুই হস্তে বর এবং অভয়সূচক মুদ্রা। তিনি মহামেঘপ্রভা, নগ্নিকা, কণ্ঠদেশের মুণ্ডমালা হতে নিঃসৃত রক্তধারায় তাঁর শ্যাম অঙ্গ রক্তাক্ত। তিনি পীনোন্নত পয়োধরা। শবরূপী শিবের উপরে দণ্ডায়মান।

তবে কোথাও কোথাও মায়ের এই তন্ত্রোক্ত আদি আদলের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। আসলে, যুগে যুগে মাতৃভক্ত শাক্ত সাধকগণ ধ্যানসমাহিত চিত্তে বিচিত্র ও বিভিন্ন রূপে মাতৃরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। এমনই এক সাধক আশুতোষ তন্ত্ররত্ন। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে তিনি থাকতেন হাওড়ার শিবপুরে বর্তমান চারাবাগান অঞ্চলে। স্থানটি ছিল জঙ্গলময়। সাধনার পক্ষে উপযুক্ত পটভূমি। এখানেই আশুতোষ তাঁর সাধনার আসন পাতেন। তিনি সাধনায় তন্ময় হয়ে যেতেন, কালীছাড়া কিছু জানতেন না। কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি একদিন স্বপ্নাদিষ্ট হন।

১৯১৪ সালের বৈশাখী পূর্ণিমায় আশুতোষের স্বপ্নলব্ধ কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হলো। মাতৃবিগ্রহ নির্মাণ করেন কুমারটুলির মৃৎশিল্পী প্রিয়নাথ পাল। দেবীর এখানে হাজারটি হাত। যার জন্য তিনি 'হাজার-হাত' কালী নামেই পরিচিত এবং প্রসিদ্ধ। দেবীর পায়ের তলে শায়িত শিব নেই, বাম পা-টি সিংহের উপর রেখে মা দাঁড়িয়ে আছে। দেবী দন্তরা ন'ন, মুখ থেকে রক্তিম জিভটি বেরিয়ে নেই। দেবীর গাত্রবর্ণ নীলাভ। দেবী সবস্ত্রা, সর্পভূষণা, এক হাতে খড়্গ, অপর হাতে দীর্ঘ ত্রিশূল। মুখমণ্ডল গম্ভীর। বিখ্যাত লেখক শিবশংকর ভারতীর মতে, "এই বিগ্রহ তৈরি হয়েছে মার্কণ্ডেয় পুরাণের মধ্যম চরিত্রের দ্বিতীয় শ্লোক অনুসারে। ...এ মূর্তি দেবীর মহিষাসুর বধের, রক্তবীজ বধের নয়, তাই শিবহীন।"

প্রতি বছর বৈশাখী পূর্ণিমায় দেবীর প্রতিষ্ঠা তিথিতে বিশেষ সমারোহে পূজার্চনা হয়, দীপাবলী অমাবস্যায় হয় সাড়ম্বর পূজানুষ্ঠান। বহু ভক্তসমাগম ঘটে।

এক সাধারণ, সাদামাটা মন্দিরে দেবীর অধিষ্ঠান। দেবীর বিশাল বিগ্রহের দিকে তাকালে বিস্ময় জাগে, ভক্তি নত হয় মন। অপূর্ব এই দর্শন। পশ্চিমবঙ্গে এ হেন ভয়াল, সুন্দর বিগ্রহ আর দ্বিতীয় নেই।

হাওড়া স্টেশনের বাসস্ট্যান্ড থেকে ৫৫এ বাসে বা ট্রামডিপো মিনি বাসে শিবপুর ট্রামডিপো, সেখান থেকে রিকশায় সহজে পৌঁছে যাওয়া যায় হাজার-হাত কালী মন্দিরে। ▯

অনুপ্রবেশ নিয়ে অধিকাংশ রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের নীতি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী

মোহনরাও ভাগবত

নাগপুরে বিজয়া দশমীর ভাষণে মোহনজী

আজকের দিনে আমাদের মনপ্রাণ ভরে রয়েছে স্বর্গীয় সুদর্শনজীর পথপ্রদর্শনের আলোকের পুণ্য স্মৃতিতে। জয়ের পথে, জননায়কদের স্মৃতি আমাদের এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে।

বিজয়াদশমী জয়ের উৎসব। সমগ্র জাতি এই উৎসব পালন করে হিংস্রতার বিরুদ্ধে মানবতার বিজয়কে স্মরণ করে। অশুভের বিরুদ্ধে শুভর জয়। এই দিনটি আমাদের কল্পিত দুর্বলতা কাটিয়ে আমাদের বিশ্বস্ততা ও সাহসের যাবতীয় সীমাবদ্ধতাকে জয় করার এবং আমাদের শৌর্য-প্রকাশের দিন হিসেবে চিহ্নিত। বর্তমানে আমরা জাতির সেই বিজয়স্তম্ভ পুনরুদ্ধার করতে পারি এবং বর্তমান বিপজ্জনক ও জটিল অবস্থা থেকে, শুধুমাত্র স্বদেশী শক্তির বহুমুখী উদ্যোগের মাধ্যমে তা করতে পারি। জনগণের মনস্তত্ত্ব এই রকমই কিছু করার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছে।

এজন্য আমরা সময় দিয়েছি এবং আমাদের স্বাধীনতার ৬৫ বছর পরেও আবার এটা করে দেখাবার সামর্থ্যও দেখিয়েছি। মানবজীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কলা, খেলা ইত্যাদি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে চর্চিত প্রতিযোগিতার আবহাওয়ায়, ওই বিষয়গুলি যা দাবি করে ভারতবর্ষের সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি, আজকের দিনে সেগুলি খুব সাধারণ। তৎসত্ত্বেও বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের সমগ্র জাতির জনগণের মনে উদ্বেগের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁরা বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত, এমনকী ভবিষ্যত সম্পর্কে তাঁদের মনে হতাশা গ্রাস করছে। শেষ এক বছরে এনিয়ে অগ্রগতি বলতে এই বিষয়গুলি সোচ্চারে উচ্চারিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। নিরাপত্তা পরিস্থিতি, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সীমানা উভয় ক্ষেত্রই, গুরুতর উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এনিয়ে তৎপরতা দেখানো দরকার এবং সরাসরি সমস্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা প্রয়োজন, যেমন আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র, সমরাস্ত্র, কারিগরিবিদ্যা এবং আমাদের সীমান্ত রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও আগ্নেয়াস্ত্রের অপ্রতুলতা, প্রকৃত রাস্তাঘাট না থাকা, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মানুষ ও জিনিসপত্র সরানোর জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব এবং যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ঠিকমতো গড়ে তুলতে না পারা। অপরপক্ষে, অপ্রয়োজনীয় বিতর্কগুলি যেমন জনজাতি বিষয়ক সমস্যাটি যা আমাদের সশস্ত্রবাহিনীর পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট-এর সঙ্গে জড়িত, এই মুহূর্তে তা সংবাদমাধ্যমের অস্বাস্থ্যকর আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ও সশস্ত্র বাহিনীর নৈতিকতায় আঘাত হানছে। তাদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে হবে জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে এবং সেইসঙ্গে জাতীয় নীতি অনুসারে স্বদেশী উৎপাদন হওয়া দরকার। এনিয়ে কোনও স্বার্থ দেখা চলবে না— তৎপরতা দেখানো প্রয়োজন এবং আমাদের নিরাপত্তা কৌশলের ক্ষেত্রে ঔদাসীন্য, অদক্ষতা এবং পারস্পরিক সংযোগের অভাব— এইসব উপলব্ধিগুলিকে তুলে ধরাও প্রয়োজন।

এটা খুবই প্রয়োজন যে আমাদের জাতীয় সীমারেখাগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য সেখানে পুরোদস্তুর নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়েন রাখা জরুরি। বদ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জসমূহও এই ব্যবস্থার আওতায় পড়বে যেহেতু সেগুলি আমাদের দেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে, জাতীয় সীমারেখাগুলির নিরাপত্তার কথাও মাথায় রেখে, সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি ও সুরক্ষা, বর্তমান

পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের বিদেশ-নীতি ও তার প্রণয়ন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই প্রেক্ষিতে আমাদের প্রশাসনের উঁচু মহল কয়েক বছর আগে বহু-প্রতীক্ষিত ঘোষণাটি হয়েছিল, 'পূর্বে তাকাও নীতি'। সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলি সচেতন হয়ে গিয়েছিল এবং স্বীকার করেছিল যে তাদের মূল্যবোধ ও ভারতবর্ষের জাতীয় জীবন একই খাতে প্রবাহিত এবং বর্তমান সময়, এমনকী আজ পর্যন্ত সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের উদাহরণ টেনে বাণিজ্য ও অন্যান্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে তাঁরা আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন। সুতরাং এই দেশগুলি যারা একদা আমাদেরই অংশ ছিল, তাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ওই দেশগুলির জনগণও এটা সমর্থন করেন। এবং অবশ্যই এই ঘোষণাটি খুব জোরের সঙ্গে ও দৃপ্তভাবে করা উচিত। তবুও শম্বুকগতির এই পদ্ধতি কার্যকারিতার দিক দিয়ে অত্যন্ত হতাশাজনক। এটা সত্যি যে চীন এই এলাকায় সর্বশক্তি দিয়ে প্রবেশ করছে আমাদের মূল প্রতিপক্ষ হিসেবে এবং আমাদের কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তাদের এই সুচতুর ধীরগতির পদক্ষেপ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আমরা জানি চীন পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের নিউক্লিয়ার টেকনোলজিও পাকিস্তানকে দিয়েছে। আমাদের জাতীয় নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করার পরিকল্পনা নিয়ে ভারতবর্ষের নিকটতম প্রতিবেশী যেমন নেপাল, মায়ানমার এবং শ্রীলঙ্কার সঙ্গে কৌশলী সম্পর্ক স্থাপন করতে অগ্রসর হয়েছে চীন। সব মিলিয়ে উল্লিখিত দেশের অধিবাসীদের মধ্যে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষেরা বাস করেন বিরাট সংখ্যায়। আমাদের দিক থেকে এই মানুষগুলির নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই ওই প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে আমাদের বিদেশ-নীতি রচিত হওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু আমাদের নিজেদের সরকার এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিগত কয়েকবছর যে ধরনের অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা কেবলমাত্র জনগণের উদ্বেগ বাড়াতেই সক্ষম হয়েছে এবং তাদের মনে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে —আমাদের দেশের স্বার্থেই কি নীতি নির্ধারিত হয়, নাকি তা হয় না? জম্মু- কাশ্মীরে গত একদশকে সরকার যে সমস্ত নীতি প্রণয়ন করেছেন, তাতে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম ফিরে আসার জন্য ট্রায়াল দেওয়া হচ্ছে। পাক-অধিকৃত এলাকার প্রতি ঔদার্য দেখানো হচ্ছে। জম্মু, লে-লাদাখ, কাশ্মীর উপত্যকার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক এবং উন্নয়নের বিষয়ে যে প্রভেদ দেখানো হচ্ছে তা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার এবং এই অঞ্চলগুলিকে দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সমগোত্রভুক্ত করতে হবে। যে সমস্ত হিন্দুরা, যাঁদেরকে গৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বলপূর্বক বিতাড়ন করা হয়েছিল, তাঁরা উপত্যকায় ফেরত আসতে চাইলে সম্মানের সঙ্গে তাঁদের নিরাপত্তা ও বসবাসের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করতে হবে। দেশভাগের সময় যাঁরা জম্মু-কাশ্মীরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁদের রাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব প্রদান করতে হবে। কিন্তু যে নীতি গৃহীত হয়েছে তা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে বাধ্য। বিকৃতমস্তিষ্ক রাজনৈতিক দলের হাতে রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষমতা থাকায় জাতীয় স্বার্থ বারবার বিঘ্নিত হচ্ছে এবং বিদেশী শক্তির চাপের কাছে আমরা নতিস্বীকার করছি। এটা প্রমাণ করে যে দেশের পূর্বপ্রান্তে আজ যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, আমরা দেশের উত্তর-পূর্বের ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে কোনও শিক্ষাই নিতে পারিনি। এর কারণ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আজ জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের জনসংখ্যা ক্রমহ্রাসমান।

বহুবছর ধরে আমরা সতর্ক করে আসছি যে অসম ও বাংলার উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ, অস্ত্র, মাদক ও জাল টাকার নোট ইত্যাদি পাচার হচ্ছে। আমাদের গোয়েন্দা দফতর, হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট, এমনকী ওই দুই রাজ্যের রাজ্যপালরাও সময়ে সময়ে এই ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন। কিন্তু এই সমস্ত সতর্কতা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, স্রেফ ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য, ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে এবং স্বচ্ছ জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণার অভাবে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। যে কারণে উত্তর-পূর্ব ভারত গভীর ক্ষত তৈরি হয়ে যাওয়া সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। অনুপ্রবেশের ফলে সৃষ্ট জনসংখ্যাগত ভারসাম্যহীনতার উল্টোপিঠে দেখা যায় এর জন্য অধিবাসীগত জনসংখ্যা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে। উত্তর-পূর্ব ভারতের অধিকাংশ জায়গায় এটাই হয়েছে এবং এর ছায়া সারা ভারতেই তার হাত প্রসারিত করছে। বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিষবৃক্ষ সেখানে নিরাপদে বাড়ছে বড় মাপের ধর্মান্তরকরণের ছায়ায়। মূলতঃ এই জন্যেই বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসবাদীরা তাদের জীবন ফিরে পেয়েছে এবং এর জন্য সরকারের দুর্বল নীতিও দায়ী। উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্তে সম্প্রসারণবাদী চীনের কালো ছায়া ক্রমশ দীর্ঘতর হচ্ছে। তাদের পক্ষে অনুকূল এই পরিবেশের ফায়দা তুলে আল কায়দা-র মতো সংগঠনগুলিও ওই এলাকায় পা রাখার চেষ্টা করছে। এরকম পরিস্থিতিতে, আমাদের সেনাবাহিনীর সক্রিয় উপস্থিতি এবং সেখানকার জনগণের অনমনীয় মনোভাব, যাঁরা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে নিরন্তর সংঘর্ষ করে বেঁচে আছেন, তাঁরাই দেশের মানুষ ও ভূমিকে রক্ষা করছেন। খুব দেরি হবার পূর্বে, যত দ্রুত সম্ভব আমাদের নীতির বদল ঘটাতে হবে। আমাদের ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ অন্যান্য রাজ্যেও অতি দ্রুত অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে হবে এবং ভোটার তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ দিতে হবে। সেইসঙ্গে তাদের রেশন কার্ড, অন্যান্য পরিচয়পত্র ইত্যাদি বাতিল করতে হবে। সেইসমস্ত অনুপ্রবেশকারী যারা অবৈধভাবে এদেশে বসবাস করছে তাদের ফেরত পাঠানোর সমস্তরকম ব্যবস্থা করতে হবে। নাগরিকদের জাতীয় পঞ্জীকরণ আদালতের সুস্পষ্ট নির্দেশ মেনেই তা করতে হবে। নিজের জন্মস্থান, বাবা, মা কিংবা ঠাকুর্দা-ঠাকুমার বাসস্থান কোথায় ছিল তা উপযুক্ত প্রমাণ সহকারে এদেশের নাগরিকদের পেশ করতে হবে।

শুধুমাত্র উত্তর- পূর্বাঞ্চলেই নয়, দেশের অন্যত্রও আমাদের অভিজ্ঞতা; জনগণের চাপে কিংবা আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করতে না পেরে, বিদেশী নাগরিক এবং সন্দেহজনক ভোটার চিহ্নিতকরণ যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে তখন সরকার ও প্রশাসন উভয়ই এই ধরনের লোকেদের অনুসন্ধানের পরিবর্তে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বেকসুর ছেড়ে দেওয়া হয় আগের মতোই কিন্তু একইসঙ্গে

বাংলাদেশ থেকে আসা নিরীহ হিন্দু অভিবাসীদের যাঁরা বহু বছর ধরে এদেশে রয়েছেন তাঁদের অযথা হয়রান করা হয়।

আমাদের সবাইকে খুব ভালভাবে বুঝতে ও গ্রহণ করতে হবে যে হিন্দু সমাজ ছড়িয়ে রয়েছে সারা বিশ্বব্যাপী। কিন্তু ভারত, যা ঐতিহ্যগতভাবে ভারত নামে সুপরিচিত একটাই কারণে, যেহেতু এটা হিন্দুদের বাসভূমি। একমাত্র এই ভূমিকেই হিন্দুরা তাঁদের পিতৃপুরুষের ভূমি বলে মনে করেন এবং এটা তাদের কাছে পরম পবিত্রও বটে। যদি হিন্দুরা এখানে সংখ্যালঘু কিংবা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন, তাহলে এই অঞ্চলের নাম পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে যাবে। ধর্মীয় কারণে নির্যাতন করে সমস্ত হিন্দুকে তাঁদের বাসভূমি থেকে যদি বলপূর্বক উচ্ছেদ করা হয় তবে তাঁদের অন্য কোথাও যাবার জায়গা নেই। সুতরাং যে কোনও অহিন্দু তিনি যেখান থেকেই আসুন না কেন, বিদেশী বলেই তিনি এখানে পরিগণিত হবেন। যাঁরা সিন্ধুপ্রদেশ কিংবা বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে সাম্প্রতিককালের মধ্যে এদেশে এসেছেন অথবা এধরনের হিন্দুদের যাদের বলপূর্বক ও তাঁদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধর্মীয় অত্যাচারের শিকার হয়ে এদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য করা হচ্ছে, সেই সমস্ত উদ্বাস্তুকে ভারতে সম্মান ও আদরের সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত। অবশ্যই এটা ভারত সরকারের দায়িত্ব যে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা হিন্দুদের স্বার্থরক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করার। এই পরিস্থিতির আরও একটি আঙ্গিক রয়েছে। অনুপ্রবেশকারীরা যেহেতু তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত, তাই অনুপ্রবেশকারীদের এমনকী বেআইনি কাজকর্মও সমর্থন করতে এগিয়ে আসছে তাদেরই কোনও কোনও মহল। উত্তর-পূর্বের অধিবাসীরা যাঁরা কর্মসূত্রে বা পড়াশুনোর সূত্রে ভারতবর্ষের অন্যপ্রান্তে থাকেন তাঁদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। মুম্বাইয়ের আজাদ ময়দানে এনিয়ে যা ঘটেছে, তা অত্যন্ত নৃশংস। এটা প্রমাণ করছে যে জাতীয়তা-বিরোধীরা, যাঁরা রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মায়ানমার সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তার প্রতিবাদে ভারতের অমর জওয়ান জ্যোতিকে কলুষিত করেছিলেন তাঁদের অস্তিত্ব এখানে আজও বর্তমান। এটি অত্যন্ত উদ্বেগ, ক্রোধ ও মর্যাদাহানির বিষয় যে অধিকাংশ প্রশাসন যে নীতি নিয়েছে তা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। এর কারণ দেশ-বিরোধী বুদ্ধিজীবী এবং সংবাদপত্রের স্তম্ভলেখকদের নির্লজ্জতা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, এধরনের শক্তি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনী ও সরকার উভয়ের জন্যই কলঙ্কবহন করে আনছে। এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক যে আমাদের সমস্ত রকম শক্তি ও প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও তারা এইসব দেশবিরোধী শক্তিকে খালি মাঠে খেলার সুযোগ দিচ্ছে কারণ তাদের পথভ্রষ্ট নীতি-ই হলো, অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের নিজেদের লোক।

আমাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের চেতনার উন্মেষ হোক। সামগ্রিকভাবে আমরা লক্ষ্য করেছি শুধুমাত্র ভোটের জন্য গত দশ বছর যাবৎ মৌলবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদকে উস্‌কে দিয়ে এমন সব নীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে যাতে হিন্দুত্বের অবমাননা হয়। আর এই প্রচেষ্টা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবিরত চেষ্টা চলছে হিন্দু সমাজের বরেণ্য সাধু-সন্তদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপবাদ দিয়ে হেনস্থা করার। যেমন লক্ষ্মণানন্দ গিরি, যিনি বনবাসীদের মধ্যে নিঃস্বার্থ সেবায় নিবেদিত প্রাণ, তাঁকে পর্যন্ত হত্যা করা হলো এবং এর পিছনে সুগভীর ষড়যন্ত্র ছিল। আর খুনীরা আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে অবাধে। ধনরাশির অপব্যবহার, তছরূপ এবং হিন্দু মন্দির সমুহের সম্পদের লুট চলছে অবাধে এবং পরিণামস্বরূপ এরই মধ্যে তৈরি হচ্ছে অবিশ্বাসের বাতাবরণ। আর এর মধ্যে দিয়েই হিন্দুত্বের বিশ্বাসের ওপর আঘাত আসছে। আঘাত আসছে হিন্দু ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ওপর। ইচ্ছাকৃতভাবে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে হিন্দু সাধু-সন্তদের তৈরি ট্রাস্টকে কেন্দ্র করে বিতর্ক সৃষ্টির। এরকম ঘটনা ঘটেছে শ্রী পদ্মনাভন মন্দিরকে নিয়ে। মন্দিরটি কেরলের তিরুবনন্তপুরমে। যদিও হিন্দু সমাজ উদারচেতা এবং সমন্বয়ে বিশ্বাসী তবুও হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আইন তৈরি করে হিন্দু সমাজের মধ্যে যে ঐক্যের বাতাবরণ রয়েছে তা বানচাল করার এক অদম্য প্রয়াস চলছে। এরা সেইসব ব্যক্তি যাঁরা গণতন্ত্রের নামে, ধর্মনিরপেক্ষতা আর সংবিধানের নামে শপথ নিয়েও ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ করে সংখ্যালঘুদের জাতীয় সম্পদের একচ্ছত্র আধিপত্যের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পাকা করার নিরন্তর প্রয়াস চালাচ্ছেন। রাজনৈতিক দলগুলি যেন শপথ নিয়েছে পরোক্ষে তারা লাভ-জেহাদ এবং ধর্মান্তরণকে সমর্থন করে হিন্দু সমাজের ক্ষতি করবেই। স্বভাবত হিন্দু মননে প্রশ্ন জাগছে যে, তাদের দ্বারা নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ তাদের স্বার্থ দেখভাল করছে কি? একনায়কতান্ত্রিক বস্তুবাদ এবং মৌলবাদী শক্তি এবং সুবিধাবাদী শক্তি বিভিন্ন রাজ্যসরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারে অনুপ্রবেশ করছে। এরাই কোমর বেঁধে নেমেছে হিন্দুত্ব ও হিন্দুস্থানকে খতম করতে। এইভাবে তারা পুনরায় দেশে একটা বিভেদ নীতি তৈরি করার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। খবরের সূত্র অনুসারে রামজন্মভূমির সংলগ্ন অঞ্চলের বিশাল ভূখণ্ডে ইসলামি সৌধ নির্মাণের প্রয়াস চালানো হচ্ছে।

রামজন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণের মামলা বহুদিন ধরে আদালতের বিচারাধীন। সুতরাং এই মুহূর্তে অবিবেচক প্রস্তাব রূপায়ণের প্রচেষ্টা কেবল জনচিত্তকে আহত করবে তা নয় বরং সম্প্রীতির আবহকে বিষময় করে তুলবে। এলাহাবাদ শীর্ষ আদালতের রায় যা ২০১০-র ৩০ সেপ্টেম্বর প্রদান করে তা স্মরণে রেখে সংসদ অতি সত্বর আইন প্রণয়ন করে রামজন্মভূমির ন্যাসকে এক সুন্দর মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেয় এবং সেইসঙ্গে রামজন্মভূমির সাংস্কৃতিক সীমার বাইরে মুসলমানদের মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দেয় তাহলে শান্তিপূর্ণভাবে এর থেকে আর ভাল সমাধানসূত্র হয় না, যা দলমতনির্বিশেষে সবাই স্বীকার করে নেয়। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক আবহ যা তাতে জাতির স্বার্থে এই ইস্যুটি সহজে সমাধান হবার আশা নেই। এর ফলে সৌহার্দ্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা রয়েছে। পৃথিবীর কোথাও এমন নজির নেই যেখানে বিশ্বের বড় কোম্পানীগুলিকে খুচরা ব্যবসায়ে লগ্নী করতে সাদরে আহ্বান জানানো হয়েছে। সুতরাং বিদেশী কোম্পানীগুলিকে খুচরো ব্যবসায়ে উৎসাহ প্রদান, বীমা ও পেনশন সেক্টরে অধিকমাত্রায় বিদেশীর জন্য দুয়ার উন্মুক্ত করা —আমাদের কোনও লাভ তো হবেই না উল্টে দেশীয় খুচরো ব্যবসায়ীদের ক্ষতি করা হবে। চাষীরা তাদের উৎপাদক সামগ্রীর উচিত মূল্য পাবে না বরং ক্রেতাদের চড়া দাম মেটাতে

হবে। এর সঙ্গে খাদ্য সুরক্ষার ব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অন্যদিকে দেশের সম্পদ লুণ্ঠিত হবে, উন্নয়নের নামে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হবে এবং তারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হবে যারা এসবের ওপর নির্ভরশীল। দেশের অতি সামান্য অংশ উন্নতি করেছে আর তাদের দেখিয়ে দেশের আর্থিক উন্নয়নের বিষয়টা রটানো হচ্ছে। এসব সত্ত্বেও দেশের আর্থিক প্রগতি নয় শতাংশ থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে মাত্র পাঁচ শতাংশে এবং সারাদেশের বাজারে চলছে মূল্যের অগ্ন্যুৎপাত। ধনী ও গরীবদের পার্থক্য ক্রমাগত বেড়েই চলেছে এবং বৈষম্য এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যা অতি ভয়ঙ্কর। একমাত্র ঈশ্বর-ই জানেন কেন এই অর্ধ-সেদ্ধ আইন উল্কাবেগে প্রণয়ন করা হচ্ছে কারুর সঙ্গে আলাপ- আলোচনা না করেই। আমাদের তথাকথিত সংস্কারের দরকার নেই, আমাদের দরকার প্রকৃত সংস্কার। সেই দিশায় আমাদের প্রকৃত অর্থে চাই নির্বাচনী সংস্থার, কর প্রণালীর সংস্কার, অভ্যন্তরীণ অডিটিং, ফৌজদারি আইনের সংস্কার। হয় এগুলো উপেক্ষিত হচ্ছে কিংবা ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে। উন্নয়নের সংজ্ঞা দুনিয়ায় যেভাবে করা হচ্ছে তাতে রয়েছে চিন্তা-ভাবনার খামতি এবং এর ফল আমাদের নিরীক্ষণ করতে হচ্ছে। উপরন্তু দুনিয়ায় ধনী বহুজাতিক সংস্থাগুলি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতেই পরিকল্পনা রচনা করতে সদা তৎপর। এর মধ্যেই আমাদের পরিকল্পনা নিজেদের রচনা করতে হবে যা আমাদের জাতীয় স্বার্থের উপযোগী, প্রয়োজন এবং সামর্থ্যের মধ্যে। অন্যথা আমরা সকলের উপযোগী, উন্নয়ন এবং প্রগতি স্থাপন করতে সক্ষম হব না, কিংবা দুনিয়া বর্তমানে যেভাবে তাদের অসম্পূর্ণ এবং শঠতা আর বিশৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাত্রা অতিবাহিত করছে তার কবল থেকে মুক্তি পেতে পারবে না।

এই অসম্পূর্ণ জীবনধারা এবং ভাবনার পরিণাম হলো জাতীয়তা বোধের অভাব এবং সেইসঙ্গে আমাদের দেশের ব্যক্তি-চরিত্রের অবনতি আরও তীব্র হচ্ছে এবং যা হলো অত্যন্ত বেদনাময়। ভয়ঙ্কর সব দুর্নীতি যা ফাঁস হচ্ছে তার কোনও কমতি নেই। অনেক ছোট-বড় আন্দোলন হচ্ছে দেশজুড়ে এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে, দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিবর্গের শাস্তি দাবি করা হচ্ছে, বিদেশে সঞ্চিত কালো টাকা দেশে ফিরিয়ে আনতে বলা হচ্ছে এবং দুর্নীতি দমনে কড়া আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হচ্ছে ওই আন্দোলনগুলিতে। সঙ্ঘের বহু স্বয়ংসেবক এইসব আন্দোলনের অংশীদার। সেই সঙ্গে আমরা জানি চরিত্রহীনতা এই দুর্নীতির মূলে, সঙ্ঘ নিজের কর্মধারায় চরিত্রগঠনে জোর দেয়। দেশ যে নীতিতে চলছে তার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা মানুষকে বুঝতে হবে, মনে রাখতে হবে হতাশ হলে চলবে না। নচেৎ আমাদের পরিস্থিতি মধ্য-প্রাচ্যের মতো হবে যেখানে মৌলবাদ, বিদেশী শক্তি যেভাবে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে অরাজকতা তৈরি করেছে তারই পুনরাবৃত্তি এদেশে ঘটায় আশঙ্কা রয়েছে। দুর্নীতির সমূল উৎপাটনের জন্য দরকার অরাজনৈতিক, আইনি আর সামাজিক চাপ। সাফল্য পেতে প্রয়োজন শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং সেইসঙ্গে খোলনলচে বদল চাই নির্বাচনী প্রক্রিয়ার এবং ব্যাপক প্রশাসনিক সংস্থার। বিভিন্ন আলাপ-আলোচনায় আমাদের সামাজিক প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ মেয়াদী পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে। ত্রুটিপূর্ণ এবং ধ্বংসাত্মক সমাজজীবনের অন্ধ অনুকরণের মোহ বর্তমানের সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিফলিত। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ঘৃণা, জাত-পাতের বিচার, সমাজের বঞ্চিত অংশের মানুষজনের ওপর অবিচার, নৈতিকতার অভাবের জন্য মহিলাদের ওপর নির্যাতন যা সমাজের শিক্ষিত সমাজ অবধি পরিব্যাপ্ত, ধর্ষণ, কন্যাভ্রূণ হত্যা, অবৈধ সহবাস, খুন, আত্মহত্যা, পরিবার প্রথার ধ্বংস, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ, একাকিত্বের হতাশা যা আগে ছিল না কিংবা থাকলেও খুবই সামান্য তা আজ সামাজিক ব্যাধিতে রূপান্তরিত ব্যাপক হারে। আমাদের আজ ভাবনার সময় এসেছে বর্তমানের নিরিখে সামাজিক মূল্যবোধকে কীভাবে সময়োপযোগী করে কাজে লাগানো যায় তারই প্রয়াস করার।

আমরা এসব দায়িত্ব সামগ্রিকভাবে রাজনীতির হাতে সঁপে দিতে পারি না, পারি না সরকার বা প্রশাসনের হাতে। ঘর থেকে শুরু করে সামাজিক স্তর পর্যন্ত আমরা কি পারি না নিজেদের তুলে ধরে এক মজবুত সামাজিক জীবনধারা গড়তে আমাদের বিশুদ্ধতা, আইনে বিশ্বাস রেখে, আচরণে সততা এবং সংবেদনশীলতার মাধ্যমে? স্মরণে রাখতে হবে প্রতিটি সংস্কার শুরু হয় আমাদের নিজস্ব জীবন দর্শন এবং আচরণের মধ্য দিয়ে। কেবল আন্দোলনের মাধ্যমে কিছু পাওয়া যায় না।

১৯২২ সালে মহাত্মা গান্ধী ছয়টি সামাজিক ব্যাধির কথা উল্লেখ করেছিলেন। এগুলি হলো—

- নীতিহীন রাজনীতি।
- বিনাশ্রমে অর্থ, সম্পদ সৃষ্টি।
- বিবেচনাহীন সুখ, আরাম।
- চরিত্রহীন জ্ঞান।
- মানবিকতাহীন কর্ম।
- ত্যাগহীন পূজা।

এইসব ব্যাধি-ই ছড়িয়ে রয়েছে দৈনন্দিন সমাজ ও রাজনীতির অন্ধগলিতে। এমতাবস্থায় শুভশক্তিকেই সমাজের জন্য কাজ করে সমগ্র সমাজকে সেই শক্তির সঙ্গী করতে হবে। এই চ্যালেঞ্জ আমাদের গ্রহণ করে অগ্রসর হতে হবে। ভারতীয় পুনর্জাগরণের পুরোধা স্বামী বিবেকানন্দ থেকেই মহাত্মা গান্ধী প্রেরণা পেয়েছিলেন। আগামী বছরে তাঁর জন্মের সার্ধ-শতবর্ষ উদযাপন করতে হবে। তাঁর বার্তা আমাদের বুঝতে হবে। আত্মমর্যাদার সঙ্গে আত্মবিশ্বাস-ই হবে আমাদের মার্গদর্শন। ধর্মপ্রাণ ভারতকে সজাগ করতে হবে আমাদের উৎসর্গকৃত, নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমে এবং মানুষের সেবা করতে হবে ঈশ্বরসেবা মনে করে এবং তা করতে হবে বিনিময়ে কিছুর প্রত্যাশা না করে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কাজই হচ্ছে প্রতিটি মানুষের মধ্যে সুপ্ত গুণাবলীর উন্মেষ ঘটানো। এটাই হলো সময়ের দাবি। আমাদের এই নিরলস কঠোর শ্রমের মাধ্যমে জাগ্রত হয়ে সমগ্র সমাজ সংগঠিতভাবে কাজ করবে। যেমন পবিত্র গঙ্গা সবরকম বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে সাগরে মেশে তেমনি আমাদের জাতির ভাগ্যাকাশে শুভ তারকা তার যাত্রা নব দিগন্ত থেকে শুরু করে পরম শিখরে পৌঁছবে। তাই তো স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন— "ওঠো, জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না!"

ভারত মাতা কী জয়!

(নাগপুরে বিজয়া দশমী উৎসবে প্রদত্ত ভাষণ)

সার্ধশতবর্ষের মূল্যায়নে
ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

প্রীতিমাধব রায়

ইংরাজী ১৮৩৮ অব্দের ১৯ নভেম্বর কেশবচন্দ্র সেন কলকাতা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ একইসঙ্গে সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সফল গৃহস্থ ছিলেন। তিনি ছিলেন গোঁড়া বৈষ্ণব। দানধ্যান, অতিথি সৎকার, দরিদ্র সেবায় তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। আবার নামগান, হরিসংকীর্তনেও তাঁর গৃহ মুখরিত থাকত। তাঁর পৌত্র কেশবচন্দ্রও শৈশব থেকে ধর্মানুরাগী ছিলেন। কেশবচন্দ্রের পিতা প্যারীমোহনও ছিলেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। বাল্যাবস্থায় তিনি সমবয়সীদের নিয়ে সংকীর্তনের দল করেছিলেন। পরবর্তীকালে কলেজস্ট্রিটের মোড়ে যেখানে অ্যালবার্ট হল স্থাপিত হয় সেখানে একটি ছোট পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ করেন। কিন্তু, শীঘ্রই তিনি হিন্দুস্কুলে ভর্তি হন। কেশবচন্দ্র ছাত্র হিসাবে খুব কৃতী ছিলেন না। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও ইংরাজিতে ভাল জ্ঞান থাকলেও গণিতে তাঁর দুর্বলতা ছিল। কিছুদিন পরেই তিনি কলেজের পড়া ত্যাগ করেন, কিন্তু জ্ঞানচর্চা তাঁর সারাজীবনই অব্যাহত ছিল ও বহু দুরূহ ও জটিল বিষয় তিনি অধিগত করেন। বড় বড় পণ্ডিতদের রচনা অধিগত করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৌলিক চিন্তাশীলতা ও বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে তিনি একজন বিখ্যাত বাগ্মী হন।

ঈশ্বরের প্রতি গভীর অনুরাগ তাঁর ছিল শৈশব থেকেই। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরে আত্মনিবেদন ও আত্মমর্যাদাপূর্ণ অশিক্ষিত মানুষের কাছে নিজের প্রাণের কথা সহজভাবে বলার জন্য তিনি কলুটোলায় ১৮৫৫ খৃস্টাব্দে একটি নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষিত ও অতিসাধারণ মানুষকে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে নীতি ও ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হোত। কেশবচন্দ্র ধর্মের সত্য পথের অনুসন্ধানী ছিলেন। পাদ্রী ব্যারন সাহেবের কাছে বাইবেল পাঠ করার সময়ে তাঁকেও লর্ড বলে ইংরাজীতে খৃস্টীয় ধারায় প্রার্থনা করতে শোনা যেত। অনেকে মনে করলেন যে, কেশবচন্দ্র বোধহয় খৃস্টানধর্ম গ্রহণ করলেন। ঈশ্বর নিরাকার এই ধারণা তাঁর মনে গ্রথিত হলেও তিনি খৃস্টধর্ম গ্রহণ করলেন না, তবে হিন্দুধর্মের কিছু আড়ম্বর ও রীতিনীতি বাদ দিয়ে হিন্দুধর্মের সার কথাটা গ্রহণে ও প্রচারে তিনি আগ্রহী হলেন। এই সময়ে কলুটোলায় তাঁর নিজের বাড়িতে গুডউইল ফ্রেটারনিটি নাম দিয়ে তিনি এক ধর্মালোচনাসভা স্থাপন করেন। এই সভায় এবং পরে যখন হিন্দু কলেজ গৃহে বৃটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি নামে একটি সাহিত্য ও বিজ্ঞান সভার অধিবেশনগুলি হোত, তাতে তিনি বক্তৃতা দিতে থাকেন। এইভাবেই তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়।

প্রথমে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বক্তৃতা ও রচনা পাঠ করে তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। ব্রাহ্মসমাজেই তাঁর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় হয়। কেশবচন্দ্রের সাধু চরিত্র, ধর্মবুদ্ধি, বহু বিষয়ে জ্ঞান ও বাগ্মিতায় আকৃষ্ট হয়ে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হন। তখনকার দিনে ব্রাহ্মধর্মকে খৃষ্টধর্মের মতোই এক

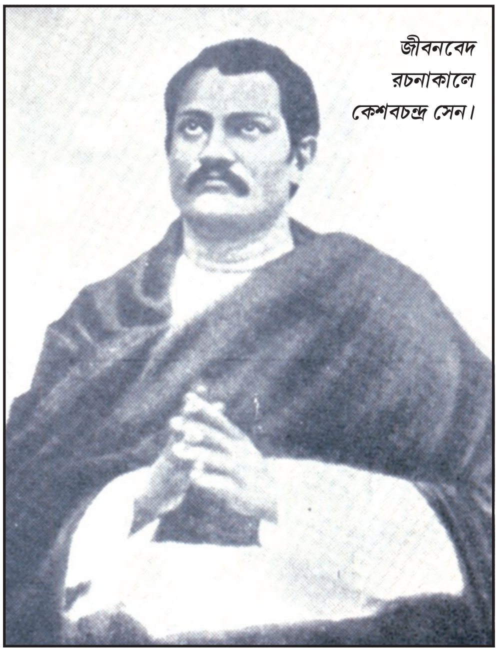

জীবনবেদ রচনাকালে কেশবচন্দ্র সেন।

হিন্দুবিরোধী ধর্ম মনে করা হোত। এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে।

রামমোহন রায়ের ধর্মচিন্তা থেকেই ক্রমশ ব্রাহ্মধর্মের সৃষ্টি হয়। ওরা যদিও ব্রাহ্মধর্ম নামে হিন্দুধর্মের থেকে কোনও পৃথক ধর্ম রামমোহন সৃষ্ট করেননি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানা ধর্মীয় ও সামাজিক মতামত ও চিন্তার সঙ্গে তিনি পরিচয় ঘটান। সুফী চিন্তায় আগ্রহী হয়ে তিনি পাটনায় আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষাকালে মূল কোরান থেকে শুরু করে ইসলামধর্মের আচার বিচার সম্পর্কিত নানা গ্রন্থ ও ৬৩টি ইসলামী উপসম্প্রদায়ের সম্পর্কে যে গভীর জ্ঞান সঞ্চয় করেন, তা মুসলমান মৌলানা, মৌলবীদের মধ্যেও ছিল না। সেজন্য তাঁকে জবরদস্ত মৌলবী বলা হোত। তাঁর মনে একেশ্বরবাদের প্রতি আগ্রহ জন্মায়। এরপর বারাণসীতে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাকালে তিনি মূল হিন্দু শাস্ত্রাদি মন্থন করেন। স্মৃতি ও উপনিষদ পড়ার ফলে উপনিষদের একবাদ তাঁকে প্রভাবিত করে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মও তিনি ভালভাবে অধ্যয়ন করেন। কর্মজীবনে তিনি হিব্রু ও গ্রীক ভাষায় বাইবেল এবং পার্শি ও ইহুদী ধর্মগ্রন্থে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। খৃস্টধর্মের ত্রিত্ববাদের বিরুদ্ধে তিনি একেশ্বরবাদী মত প্রচারে সহায়তা করতেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম নামে এক পৃথক ধর্ম স্থাপনা করে হিন্দু একেশ্বরবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করার কোনও প্রচেষ্টা তাঁর ছিল না। তিনি প্রথমে 'আত্মীয়সভা' নামে ধর্ম ও সামাজিক উদারমতাদি আলোচনার জন্য একসভা স্থাপন করেন; পরে ব্রহ্মসভাও তাঁর দ্বারা স্থাপিত হয়। ওই সভার ট্রাস্টডিড থেকে জানা যায় যে, সভার উপাস্য হলেন ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পালনকর্তা অনাদি-অনন্ত, অগম্য, অপরিবর্তনীয় এক পরমেশ্বর। হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান নির্বিশেষে সকলেই সেখানে উপাসনার

অধিকারী। প্রেম, নীতি, ভক্তি, দয়া, সাধুতার উন্নতিকল্পে এবং সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যবন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য উপদেশ, বক্তৃতা, প্রার্থনা, সঙ্গীত ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে। এক কথায় সভার উদ্দেশ্য সার্বভৌমিক উপাসনা ধ্যান ও উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে নিষ্কাম কর্ম ও সমাজসংস্কারকে তিনি গুরুত্ব দেন। সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান ইংরাজ শাসকের সহায়তায় সতীদাহ নিবারণ। রামমোহন শাস্ত্র মানতেন। তবে তিনি বলতেন, শাস্ত্রার্থ নির্ধারণে বিচারের অধিকার আছে। প্রাচীন ধর্মাদর্শের যুক্তিসম্মত সংস্কার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা তাঁর লক্ষ্য ছিল।

রামমোহন রায়ের যুক্তিবাদী চিন্তার শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত, আর তাঁর ভক্তিবাদী চিন্তার অনুসারী ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথই ব্রাহ্মধর্মকে একটি পৃথক ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠা করেন বলা যায়। তাঁর সময় থেকে ব্রাহ্মধর্মে পৃথকভাবে দীক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয়। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন রায়ের উত্তরসূরী হলেও ব্রহ্মচিন্তা তাঁর মনে উদ্ভূত হয় পৃথকভাবে। ঈশোপনিষদের প্রথমমন্ত্র ‘ঈশাবাস্যমিদং সর্বং’ ইত্যাদি লেখ্য একটি পুস্তকের ছিন্নপত্র পাঠ করে। ৫৫নং আপার চিৎপুর রোড, বর্তমানে যা রবীন্দ্রসরণী নামে পরিচিত, সেখানে দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত আদি ব্রাহ্মসমাজ আজও বর্তমান আছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাও স্থাপন করেন। অক্ষয়কুমার দত্ত ওই পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। ওই পত্রিকায় বেদ, বেদান্ত ও পরব্রহ্ম বিষয়ক তত্ত্বাদি আলোচিত হলেও অক্ষয়কুমারের ধর্মবিষয়ক মতামত দেবেন্দ্রনাথের থেকে ভিন্ন ছিল।

রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের ভক্তিবাদী ধর্মের দিকটির পরিপূর্তি ও পরিমার্জন করেন দেবেন্দ্রনাথের শিষ্য কেশবচন্দ্র সেন। বিশ্বের সকল ধর্মের মধ্যে ঐক্য সাধনের পথনির্দেশ ও বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মপ্রচারকদের আদর্শের সমন্বয় প্রয়াস আধ্যাত্মিক চিন্তার ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের এক অনন্য অবদান। সকল ধর্মের প্রতি তাঁর মনোভাব ছিল মুক্ত ও উদার। দেবেন্দ্রনাথই কেশবচন্দ্র সেনকে ‘ব্রহ্মানন্দ’ উপাধিতে ভূষিত করেন।

কেশবচন্দ্র প্রায় দুই বৎসর ভারত পর্যটন করেন এবং কুসংস্কার যুক্ত অনুষ্ঠান, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, উপবীতধারণ, মদ্যপান, অবরোধ প্রথা, নিরক্ষরতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রচার করেন। তিনি ‘ধর্মতত্ত্ব’

ইংলন্ডে কেশবচন্দ্র সেন

নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন।

দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্র আচার্য রূপে বৃত হন। তিনি অসবর্ণ বিবাহের সমর্থক ও যীশুখৃস্টের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। এই সমস্ত কারণে আদি ব্রাহ্মসমাজের অনেক সদস্য কেশবচন্দ্রের বিরোধী হন। মতদ্বৈধ প্রকট হয়ে ওঠায় ১৮৬৮ সালে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা পৃথক হয়ে বর্তমান কেশব সেন স্ট্রিটে ‘ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ’ গড়ে তোলেন। এই উপলক্ষে কলকাতায় এক বিরাট নগরসংকীর্তন হয়। কিন্তু কেশবপন্থীদের গুরুবাদ, অগণতান্ত্রিক বিচার, নিজেরই সৃষ্ট বিধি ভঙ্গ করে কেশবচন্দ্র কর্তৃক নিজ বালিকা কন্যা সুনীতিদেবীকে সম্পূর্ণ সনাতন হিন্দুমতে অগ্নিসাক্ষী করে ও শালগ্রামশিলা সমক্ষে কুচবিহারের রাজকুমারের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ায় কেশবচন্দ্রের অনেক অনুগামী ১৮৭৮ সালে পৃথক হয়ে ‘সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ’ স্থাপন করেন। এই অংশে মূলতঃ যুক্তিবাদী তরুণ সমাজ, যথা আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ছিলেন। প্রবীণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নূতন সমাজকে আশীর্বাণী পাঠান। ওই সময়ে সমাজের ১২৪টি শাখা ছিল, যার মধ্যে ৮০টি বঙ্গদেশে, ৮টি অসমে, ৬টি বিহারে, ১১টি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, ৫টি দক্ষিণ ভারতে, ৫টি অযোধ্যা প্রদেশে, ৭টি বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে, ২টি সিন্ধুপ্রদেশে ছিল। ইংরাজি, বাংলা, মারাঠি, উর্দু ও হিন্দী ভাষায় ২১টি সমাজ পত্রিকা ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে প্রয়াত রাজা রামমোহন রায় স্মরণে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়, কেশবচন্দ্র অন্যত্র আর একটি সভা করেন।

লর্ড লরেন্স ও বৃটেনের একেশ্বরবাদীদের আমন্ত্রণে কেশবচন্দ্র ইংল্যান্ডে যান এবং সেখানে বিভিন্ন সভায় ধর্ম, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর বক্তৃতা বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। রাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন কেশবচন্দ্রকে ভোজে আপ্যায়িত করেন।

কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয় ঘটলে তাঁরা পরস্পরের মধ্যে মিল খুঁজে পান। জার্মান মনীষী ম্যাক্সমূলারের মতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবেই কেশবচন্দ্র ১৮৮০ সালে ‘নববিধান’ আদর্শের প্রবর্তন করেন। নববিধানের মূল কথা হলো জাতিধর্ম নির্বিশেষে সর্বজনের মধ্যে একাত্মতা স্থাপন ও জ্ঞানের ভিত্তিতে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ সাধন। কেশবচন্দ্রে ‘ব্রহ্মগীতোপনিষৎ’ নবজীবন আদর্শের প্রধানগ্রন্থ ‘ইন্ডিয়ান মিরর’ ছিল নববিধান গোষ্ঠীর মুখপত্র।

জাতীয় সমস্যাদি সমাধানের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসাধনার ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ পারস্পরিক সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে একত্র বসবাস ও মিলিত উপার্জনে জীবনযাপনের জন্য ‘ভারত আশ্রম’ স্থাপন।

কেশবচন্দ্র মাতৃভাষায় ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তন করেন এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে চয়ন করে ‘শ্লোকসংগ্রহ’ নামে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। জীবনের শেষ পাঁচটি

যৌবনে কেশবচন্দ্র

বৎসর তিনি সমন্বয় ধর্ম প্রচার, গ্রন্থরচনা ও সংস্কার কর্মে অতিবাহিত করেন। ধর্মাদর্শ প্রচারের জন্য তিনি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ ও ভাষ্য রচনা ও সাধকদের জীবন চরিত রচনা করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক আত্মজীবনী 'জীবনবেদ' ও 'নবসংহিতা'। সকল সম্প্রদায়ের সাধকদের নিয়ে সাধুমণ্ডলীর পত্তন করেন তিনি।

কেশবচন্দ্রের আদর্শ ও আচরণে এক সময় খৃস্টধর্মের প্রবল প্রভাব দেখা যায়। নববিধান মন্দিরে আচার্য অভিষেক, নব ধর্মে দীক্ষাদান, শেষ ভোজন প্রভৃতি খৃস্টীয় ধরনের অনুষ্ঠান হতে থাকে। জীবনের শেষ পর্যায়ে সম্ভবত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবেই তিনি খৃস্টানি মনোভাব কিছুটা ত্যাগ করেন এবং অন্তর্লৌকিক বেদান্তিক যোগক্রিয়ায় আকৃষ্ট হন। শেষদিকে আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহযোগিতায় নববিধান সভায় বৈষ্ণবদের অনুরূপ সংকীর্তনের প্রবর্তন করা হয়। কেশবচন্দ্রের জীবন ও মননে একাধারে ভক্তিবাদ, অতীন্দ্রিয়বাদ, সমাজসংস্কার ও মুক্তির প্রেরণা দেখা যায়।

কেশবচন্দ্রের কাছে ধর্মের প্রত্যয় ছিল প্রকৃতিগত অর্থাৎ ঈশ্বরোপলব্ধির জন্য মানুষের সহজাত ওই প্রবণতা ও অধ্যাত্মবোধই সেখানে মূলকথা। তিনি লিখেছেন, 'গির্জায় যাইব, না মসজিদে যাইব, দেবালয়ে যাইব, না বৌদ্ধদের দলে যোগ দিব তাহার কিছুই ভাবিতাম না। প্রথমেই বেদ বেদান্ত কোরাণ পূরণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে প্রার্থনা, তাহাই অবলম্বন করিলাম' (জীবনবেদ)। নিষ্কাম প্রার্থনাই তাঁর ধর্মের প্রথম সোপান। পৃথিবীর পাপপঙ্কিল পরিবেশ পরিত্যাগের জন্য তিনি 'পাপবোধ' জাগ্রত করার উপদেশ দেন দ্বিতীয় সোপান রূপে। তমসাচ্ছন্ন ও জড়তাগ্রস্ত আবেশ থেকে জীবনকে মুক্ত করার জন্য অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নেওয়া ছিল তৃতীয় সোপান। ক্রমে বিবেক জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি অতিক্রম করে সার্বভৌম স্তরে উপনীত হওয়ার অভিমত প্রকাশ করেন। সর্বোপরি তিনি বৌদ্ধ আদর্শে বৈরাগ্য স্থাপন করেন।

কেশবচন্দ্রের নববিধান আদর্শের মর্মকথা হলো জীবনের পরিপূর্ণতা। পূর্ণ যিনি তাঁকে উপলব্ধি করতে হলে নিজ জীবনের পূর্ণতা, অর্থাৎ ঈশ্বর ও মানবিক শুভবুদ্ধিগুলির উন্মেষ চাই। এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মিল আছে। কেশবচন্দ্র ধর্মচর্চাকে বিজ্ঞানমুখী করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে ঈশ্বর মানবমনে সদাই মূল্যবোধ সঞ্চার করেন।

কেশবচন্দ্র বলেছেন, গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা, পরমত অসহিষ্ণুতা নববিধান ভাবের একান্ত বিরোধী জানিয়া উহাদিগকে নিয়ত পরিহার করিবে। তোমাদের প্রেম সাম্প্রদায়িক অনুরাগ না হইয়া সার্বভৌমিক ঔদার্য হউক। যদি তোমরা কেবল আপনাদের লোক, আপনাদের ধর্মমন্ত্রে ও মহাজনদের ভালবাস, ইহাতে আর তোমাদের কি গৌরব? তোমরা নূতন সম্প্রদায় গড়িবে না, সকল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবে। তোমরা নূতন ধর্মমত সংসৃষ্ট করিবে না, কিন্তু সকল ধর্মমতের সামঞ্জস্য সম্পাদন করিবে। মহান আধ্যাত্মিকতাবাদ ও সমন্বয় চিন্তা, প্রবল কর্মশক্তি সত্ত্বেও কেশবচন্দ্রের ধর্মমত কিছুটা অস্থির।

তিনি নিষ্কাম-কর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। একদিকে ভারত ও ইংল্যান্ডে রচনা প্রকাশ করতেন, ভারতীয় নারীদের দুঃখে বিচলিত হয়ে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ, রেভারেন্ড লালবিহারী দে ব্রাহ্মধর্মের বিরোধিতা করতেন তার যোগ্য উত্তরদান। জাতিভেদ বিলোপ, অসবর্ণ বিবাহ, সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ, বাংলার মফস্বল ও গ্রামে এবং বাংলার বাইরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা তাঁর মহান কাজ। ১৮৬৬ সালে ইন্ডিয়ান মিররে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী বাংলায় ৫৪টি, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১২টি, পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে ১টি করে ব্রাহ্মসমাজের শাখা স্থাপিত হয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের দুর্ভিক্ষে ব্রাহ্মসমাজ সেবাকার্য করেন। অনেকগুলি বালক ও বালিকা বিদ্যালয়, ৩৭টি সাময়িক পত্রিকা ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা পরিচালিত হোত। ভিক্টোরিয়া কলেজ নামক নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাঁরই উদ্যম ও অধ্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ভারতসংস্কার সভাও প্রতিষ্ঠা করেন। মূলত সাহিত্য বিভাগ, স্ত্রীবিদ্যালয় বিভাগ, দাতব্য বিভাগ, শ্রমজীবীদের শিক্ষাবিভাগ ও সুরাপান নিবারণ বিভাগ ওই সভার অন্তর্গত ছিল। ১৮৮৪ অব্দের ৮ জানুয়ারি বহুমূত্র রোগে কেশবচন্দ্রের ধর্মময় ও কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে। নূতন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করলেও কেশবচন্দ্র তরুণ হিন্দুদের খৃস্টধর্ম গ্রহণের মোহ থেকে রক্ষা করেন। হিন্দুসমাজ এজন্যে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। ☐

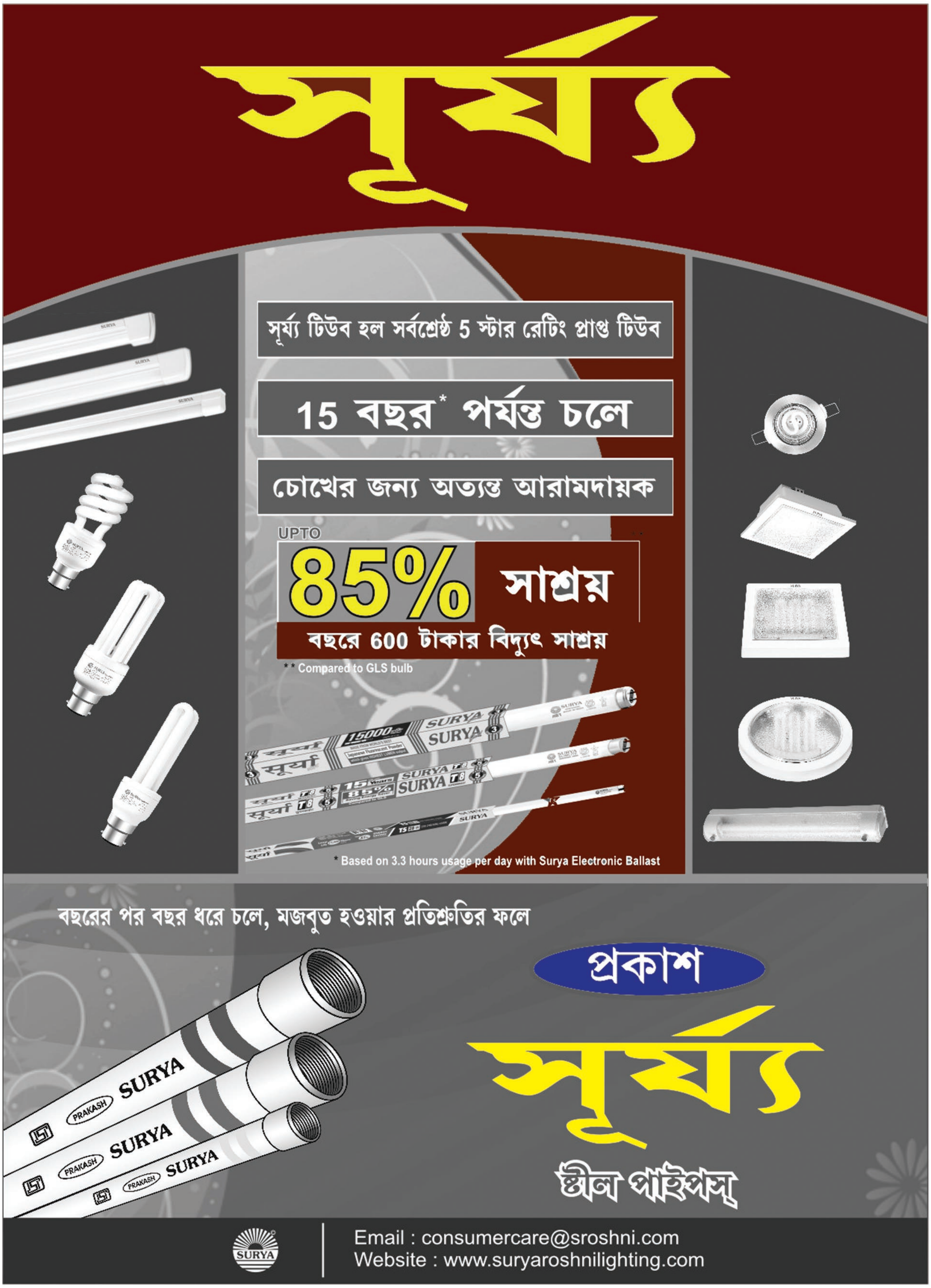
সূর্য্য
সূর্য্য টিউব হল সর্বশ্রেষ্ঠ 5 স্টার রেটিং প্রাপ্ত টিউব
15 বছর* পর্যন্ত চলে
চোখের জন্য অত্যন্ত আরামদায়ক
UPTO
85% সাশ্রয়
বছরে 600 টাকার বিদ্যুৎ সাশ্রয়
** Compared to GLS bulb
* Based on 3.3 hours usage per day with Surya Electronic Ballast
বছরের পর বছর ধরে চলে, মজবুত হওয়ার প্রতিশ্রুতির ফলে
প্রকাশ
সূর্য্য
ষ্টীল পাইপস্
SURYA
Email : consumercare@sroshni.com
Website : www.suryaroshnilighting.com

उदीयमान मध्य
कृषि को मिला मजबूत आधार
देश में सबसे ज्यादा 18 प्रतिशत
विकास दर वाला प्रदेश।
कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में
लगातार वृद्धि 12 प्रतिशत
आर्थिक विकास दर।
D-72763/1
समाज और सरकार के प्रयासों से समृ

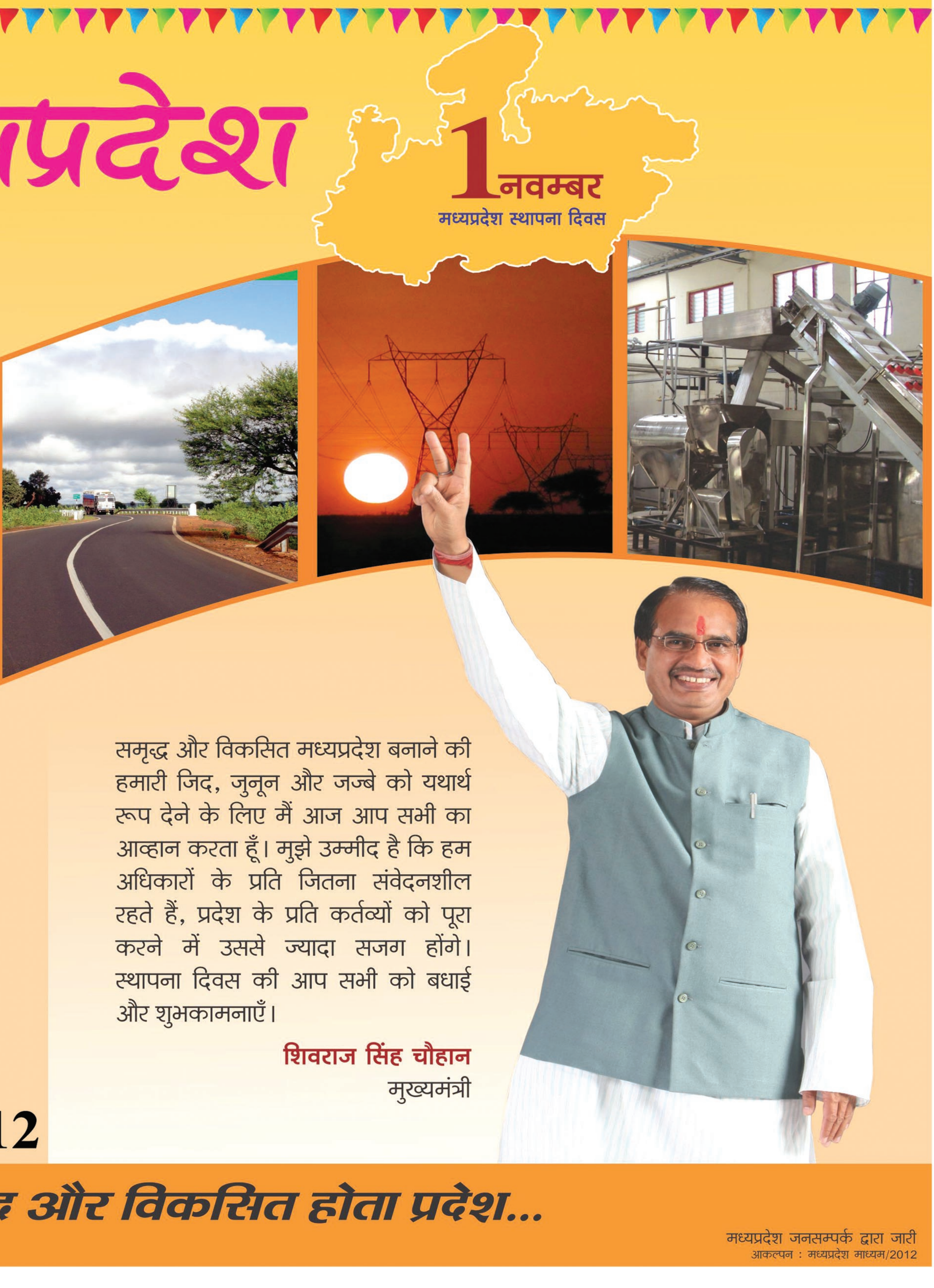
प्रदेश
1 नवम्बर
मध्यप्रदेश स्थापना दिवस
समृद्ध और विकसित मध्यप्रदेश बनाने की हमारी जिद, जुनून और जज्बे को यथार्थ रूप देने के लिए मैं आज आप सभी का आव्हान करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम अधिकारों के प्रति जितना संवेदनशील रहते हैं, प्रदेश के प्रति कर्तव्यों को पूरा करने में उससे ज्यादा सजग होंगे। स्थापना दिवस की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएँ।
शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री
12
और विकसित होता प्रदेश...
मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी
आकल्पन : मध्यप्रदेश माध्यम/2012

SATYANARAYAN ACADEMY

(A unique residential coeducational English Medium Secondary School)

Affiliated to CBSE (New Delhi - 2000)

Monthly Charge Rs. 3000/- Onwards with Fooding & Tuition etc. Girl will get 50% concession in tuition fee

Kolkata Address : 7B, Kiran Sankar Roy Road, 4th Floor, Kolkata - 700 001

For Further insertion contact - 9433175048 (M)

আসবাব

বর্ধমান

(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

ALWAYS EXCLUSIVE

Vandana™

SAREES

Cotton Printed Sarees

Contact - 22188744/1386

গহনা যদি গড়াতে চান
যে কোনও স্বর্ণকারকে

স্ুপার

ক্যাটলগ দেখাতে বলুন

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাক এণ্ড সন্স

১৫-ডি, গরাণহাটা স্ট্রীট, কলি-৬

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়,
রোদ বৃষ্টিতে কিসের ভয়!

অক্ষয় কুমার পালের
ফোল্ডিং ছাতা

বড়বাজার,কলকাতা-৭০০ ০০৭,
ফোন ঃ ২২৪২৪১০৩

Steelam

EXCLUSIVE FURNITURE

স্টীলম এর ......
পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room
দেওয়া হইবে॥

Factory :- 9732562101

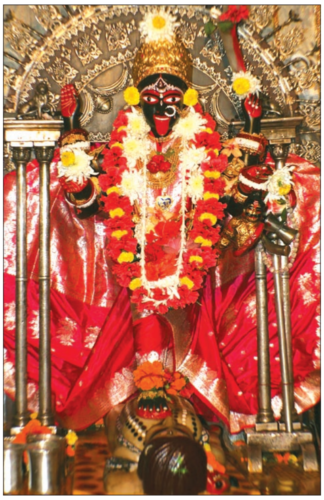

কেশব সেন কালী মেনেছিলেন?

অর্ণব নাগ

একটি মহাবিতর্কিত প্রশ্নকে সম্বল করে আমাদের যাত্রা শুরু হচ্ছে। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'-এ ঠাকুরের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে, 'কেশব এখন কালী মানেন--- চিন্ময়ী কালী-আদ্যাশক্তি। আর মা মা বলে তাঁর নাম গুণকীর্তন করেন।' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, অখণ্ড সংস্করণ, পৃ. ৩৭৪)। স্বয়ং 'কথামৃত'কার শ্রীম-ও লিখেছেন, ''শুনেছি কেশব সেন ঠাকুরের কাছে কালী মানিয়াছেন। এই কি 'মন্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী'— কেশব এই কথা বলিতেন।'' কালী মানা, না মানা ব্যাপারটা মানুষের ব্যক্তিগত বিষয় হতে পারে, কিন্তু কেশব সেনের বেলায় এই কথাটা খাটে না। আফটার অল, তিনি ব্রাহ্ম। অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। শুধু নিছক একজন সাধারণ ব্রাহ্ম-ই নন, সমকালে ব্রাহ্ম-সমাজের একজন কেন্দ্রীয় চরিত্র। তায় দু'দুটি ব্রাহ্ম-সমাজের জন্মদাতাও। প্রথমে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, পরে নববিধান ব্রাহ্মসমাজ। এহেন নিরাকারের উপাসক জলজ্যান্ত মা কালীকে মেনে নিলে সেই ধর্মাদর্শ যে সংকটের জটিল ঘূর্ণাবর্তে পড়বে সহজবোধ্য কারণেই তা অনুমান করা যায়। পরবর্তীকালে এও দেখা যায়, 'কেশব সেনের ভাবে তৈরি' নববিধান সমাজের 'নববৃন্দাবন' নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী'তে কেশব সেনের 'নববিধান'কে 'জাল ব্রাহ্মধর্ম হিসেবে জেনে' এর থেকে দূরে সরে যেতে ব্রাহ্মদের অনুরোধ জানানো হয়েছিল। একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীম-র উপরোক্ত মন্তব্য থেকে যে, কেশব চিন্ময়ী কালী মেনেছিলেন, মৃন্ময়ী কালী নয়। কিন্তু তাতেও বিতর্কের অবসান হবার সম্ভাবনা কম। মৃন্ময়ী কালীকে (ধরে নেওয়া যেতে পারে এই কালী দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী) না দেখলে চিন্ময়ী কালীর রূপদর্শন কীভাবে সম্ভব, সঙ্গতভাবেই এ প্রশ্ন উঠতে পারে।

এই প্রসঙ্গে একটি কৌতুকবহ সংবাদের দিকে নজর দেওয়া যাক। ১৮৮২ সালে লক্ষ্মীপুজোর দিন জাহাজে গঙ্গায় বেড়াতে বেড়াতে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সহাস্য কেশবচন্দ্রের জিজ্ঞাস্য ছিল, ''কালী কতভাবে লীলা করেছেন, সেই কথাগুলো একবার বলুন।'' সহাস্যেই জবাব দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, ''তিনি নানাভাবে লীলা করেছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী, নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই, চন্দ্র সূর্য গ্রহ পৃথিবী ছিল না; নিবিড় আঁধার। তখন মা কেবল নিরাকারা মহাকালী— মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন। শ্যামাকালীর অনেকটা কোমলভাব— বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থ বাড়িতে তাঁরই পূজা হয়। যখন মহামারী দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয়— রক্ষাকালী পূজা করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহার মূর্তি। শব, শিবা, ডাকিনী-যোগিনী মধ্যে শ্মশানের উপর থাকেন। রুধির ধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয় তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন।'' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, অখণ্ড সংস্করণ, পৃ. ৮৫)। লক্ষণীয়, নিবিড় আঁধারে যে নিরাকারা মা কালীর রূপের কথা বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, কেশব-অনুগামী ব্রহ্মদের কাছে তা যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য নিশ্চয়ই মনে হয়েছিল। যে কারণে কেশব অনুগামী চিরঞ্জীব শর্মা (প্রকৃত নাম ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল) এই ভাবেই উদ্বুদ্ধ হয়ে রচনা করেছিলেন, 'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি' গানখানি।

'মা'-এর নাম নেওয়াটা এতকাল ব্রাহ্মসমাজের গান ও কড়চায় সীমাবদ্ধ থাকলেও রামকৃষ্ণ-কেশবচন্দ্র যোগাযোগের পরই যে 'মা'-এর নামে গুণকীর্তন তাঁদের সমাজের সাধনার অন্যতম বিষয় হয়ে ওঠে স্বয়ং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনই তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। যা ছিল ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব। 'আচার্য কেশবচন্দ্র' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে কেশব অনুগামী আচার্য গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় আর্যনারী- সমাজে কেশব প্রদত্ত ভাষণের যে উল্লেখ করেছেন তাতে দেখা যায়, ''ঈশ্বরকে জননী বলিয়া স্বীকার করা আমাদিগের মধ্যে নতুন ব্যাপার নহে। ...কিন্তু এখন যেভাবে আমরা ঈশ্বরকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতেছি সেই ভাব সম্পূর্ণ নতুন। ...ঈশ্বর দেখিলেন, এখন ব্রাহ্মদিগের যেরূপ অবস্থা ইহাতে তাঁহারা কেবল তাঁহাকে গুণনিধি বলিলে তাহাদিগের পরিত্রাণ হইবে না। এজন্য তিনি আমাদিগের নিকট তাঁহার মিষ্টতর 'মা' নাম প্রেরণ করিলেন।'' বলাই বাহুল্য, কেশবচন্দ্রের এই ইঙ্গিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি। কারণ ঠাকুর কেশব সেনকে একদা বলেছিলেন, ''তোমরা সাকার মান না, তাতে কিছু ক্ষতি নাই; নিরাকারে নিষ্ঠা থাকলেই হলো। তবে সাকারবাদীদের টানটুকু নেবে। মা বলে তাঁকে ডাকলে ভক্তি-প্রেম আরও বাড়বে।'' (কথামৃত, অখণ্ড সংস্করণ, পৃ. ৩৮)

কেশব সেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের এই উপদেশ শিরোধার্য করেছিলেন, তার স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ কেশব অনুগামী গিরিশচন্দ্র সেনের সাক্ষ্য। 'আদি কথামৃত' গ্রন্থে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন, ''পরমহংস-জীবন হইতেই ঈশ্বরের মাতৃভাব অনেক পরিমাণে ব্রাহ্ম-সমাজে উদ্দীপিত হয়। সরল শিশুর ন্যায় ঈশ্বরকে সুমধুর মা নামে সম্বোধন এবং তাঁহার নিকট শিশুর মতো প্রার্থনা ও আব্দার করা এ অবস্থাটি তাহা হইতে আচার্যদেব (কেশবচন্দ্র) অধিকতররূপে প্রাপ্ত হন।'' (শ্রীরামকৃষ্ণকে

যেরূপ দেখিয়াছি, স্বামী চেতনানন্দ সম্পাদিত, পৃ. ৩৭০)। শ্রীরামকৃষ্ণ অনুগামী ভক্ত রামচন্দ্র দত্তও এবিষয়ে অনুরূপ কথা বলেছেন। ঠাকুরের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের মায়ের নামগানের একটি অনবদ্য চিত্র ধরা রয়েছে কেশব-শিষ্য প্রিয়নাথ মল্লিকের স্মৃতিকথায়, ‘‘আমরা একবার কেশবের সঙ্গে বাষ্পীয়পোতে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে গিয়েছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে স্পর্শ করে সমাধিস্থ হলেন। পরে দুজনেই পরস্পরের হাত ধরে গাইতে গাইতে নাচলেন। ‘মা আমাদের আর আমরা মায়ের।’ সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য হয়েছিল।’’ (তদেব, পৃ. ৩৮১)। এ সংক্রান্ত আরও কিছু প্রমাণ আমাদের হাতের সামনেই রয়েছে। যেমন ১৮৮৬ সালে আগস্ট সংখ্যায় ‘সমসাময়িক’ গ্রন্থের ‘পরিচারিকা’য় লেখা হয়েছিল, ‘‘ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের মাতৃভাব বিশেষরূপে পরমহংসের জীবনের প্রভাবেই সঞ্চারিত হয়।’’ (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, পৃ. ২০৬)। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ওরফে চিরঞ্জীব শর্মার ‘কেশব চরিত’-এ দেখা যায়, ‘‘ব্রাহ্মসমাজে এক্ষণে যে, ভক্তিলীলা বিলাস ও মাতৃভাবের প্রকাশ দেখা যাইতেছে তাহার প্রধান সহায় পরমহংস রামকৃষ্ণ। তিনি শিশু বালকের মতো মা আনন্দময়ীর সহিত যেমন কথা কহেন এবং হরিলীলার তরঙ্গে ভাসিয়া যেমন নৃত্য-কীর্তন করেন, শেষজীবনে কেশব অবিকল তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন।’’

উপরোক্ত তথ্য-প্রমাণ থেকে মনে হয়, কেশবচন্দ্র সেন ‘মা’ কে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজীদের বক্তব্য ছিল এই ‘মা’ যে কালী তার কোনও প্রমাণ নেই। বরং ইনি নিরাকারা জগন্মাতা হওয়াই স্বাভাবিক। তবে এই যুক্তি আদৌ গ্রহণযোগ্য কিনা তার বিচার করা দরকার। কারণ কালীপূজক শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবেই যে কেশবচন্দ্রের ‘মাতৃভক্তি’র উন্মেষ ঘটেছিল, কেশব-অনুগামীরাই তা লিখে গিয়েছেন। ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে’ (অখণ্ড সংস্করণ, পৃ. ৩০৩) দেখা যায়, কেশবচন্দ্রের শেষ অবস্থায় তাঁকে দেখতে গিয়ে ঠাকুর প্রাথমিকভাবে কেশব-অদর্শনে ব্যাকুল হয়ে পড়লে তাঁকে ব্রাহ্মভক্ত প্রসন্নকুমার সেন জানাচ্ছেন— তাঁর (কেশবের) অবস্থা আর একরকম হয়ে গেছে। আপনারই মতো মা-র

বীণাবাদনরত কেশবচন্দ্রের দুর্লভচিত্র।

সঙ্গে কথা কন। মা কি বলেন, শুনে হাসেন-কাঁদেন।’ এ-প্রসঙ্গে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ কেশব কর্তৃক রামকৃষ্ণ- পূজার খবর। রামচন্দ্র দত্তের বক্তব্য, ‘‘কেশববাবু যখন পরমহংসদেবের নিকট গমন করিতেন। তিনি হিন্দুদিগের দেবদর্শনে যাইবার পদ্ধতি অবলম্বনপূর্বক পুষ্প কিংবা একটি ফল লইয়া যাইতেন। উহা তিনি গুপ্তভাবে প্রদান করিতেন এবং আসিবার সময় চরণ-স্পর্শিত কোনও একটি দ্রব্য লইয়া আসিতেন।’’ (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, পৃ. ১৯৪)। এর সমর্থনে গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর টীপ্পনি : ‘‘সুরেশচন্দ্র দত্ত তাঁর ‘পরমহংস শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ’ গ্রন্থে কেশব কর্তৃক গোপনে ফুল দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণপূজার উল্লেখ করেছেন। এই সংবাদ তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছ থেকে পান। সুরেশচন্দ্রের গ্রন্থ বেরোয় ১৮৯৪ সালে, বিজয়কৃষ্ণ তখন জীবিত। স্বামী সারদানন্দ লীলাপ্রসঙ্গে জানিয়েছেন, ওই ঘটনার বিবরণ তিনিও বিজয়কৃষ্ণের কাছেই শুনেছেন।’’ (তদেব, পৃ. ১৯৪)।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির যাঁর এহেন পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন, রামকৃষ্ণ- প্রভাবে তিনি যে হিন্দু পৌত্তলিকতা বাদে আকৃষ্ট হবেন তাতে আর নতুন কথা কী! ‘রইস অ্যান্ড রায়ত’ পত্রিকা-কে উদ্ধৃত করে শঙ্করীপ্রসাদ বসু জানিয়েছেন, ‘‘লর্ড লরেন্সের মৃত্যুর পরের বছরই (১৮৮০) কেশব দীর্ঘ রচনায় বললেন, ‘হিন্দু পৌত্তলিকতাকে একেবারে এড়িয়ে গেলে বা বাতিল করলে চলবে না। অখণ্ড ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করার সময় যদি তাঁর স্বরূপের ওই দিকগুলির বিষয়ে (যেগুলির প্রতীক হিন্দু দেবদেবী) উদাসীন থাকা যায়, তাহলে একেবারে অ্যাবস্ট্রাক্ট (বিমূর্ত) ঈশ্বরে বিশ্বাস করা হয়— তা আমাদের বাস্তব যুক্তিবাদ ও নাস্তিকতার দিকে টেনে নিয়ে যাবে। যদি তাঁকে তাঁর সকল প্রকাশের সঙ্গে উপাসনা করতে হয় তাহলে তাঁর এক গুণের নাম দেবী সরস্বতী, অন্য গুণের নাম লক্ষ্মী, মহাদেব, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি। প্রতিদিন নূতন নামে ঈশ্বরের উপাসনা করো— তার মানে তাঁর নূতন গুণের উপাসনা।’ নিজের বাড়িতে দুর্গাপুজোর ব্যাখ্যায় এরকম কথাই বলেছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র। সাক্ষী ছিলেন শ্রীম। কেশবের কথাগুলো তিনি ঠাকুরকেও শুনিয়েছিলেন। কেশব সেন বলেছিলেন, ‘‘যদি মাকে পাওয়া যায়— যদি মা-দুর্গাকে কেউ হৃদয়মন্দিরে আনতে পারে— তাহলে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ আপনি আসেন। লক্ষ্মী অর্থাৎ ঐশ্বর্য, সরস্বতী অর্থাৎ জ্ঞান, কার্তিক অর্থাৎ বিক্রম, গণেশ অর্থাৎ সিদ্ধি— এসব আপনি হয়ে যায়— মা যদি আসেন।’’ (কথামৃত, অখণ্ড সংস্করণ, পৃ. ৭৬)। উল্লেখ্য, ১৮৮২ সালের ২২ অক্টোবর তাঁর ডায়েরিতে একথাগুলি লিখেছেন শ্রীম। অর্থাৎ তখন দুর্গাপুজোর সময় এবং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে সেই সময়ই পুরোপুরি আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন কেশব সেন।

উপরের আলোচনায় একটা জিনিস স্পষ্ট, জগন্মাতার নাম-গানে কেশব মোহিত হলেও হিন্দু পৌত্তলিকতাবাদও তাঁর মধ্যে যথেষ্টই প্রভাব বিস্তার করেছিল। সুতরাং মা কালীকে মেনে নিতে অন্তত সেই কালখণ্ডে কেশবের আপত্তি থাকার কথা নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ খুব ভাল করেই জানতেন কেশব সেন তাঁর অনুরাগী হলেও নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম। সুতরাং কেশব ও তাঁর ভক্তরা মা-কালীকে সহজভাবে মেনে নেবে না। তাঁর ‘মা’ এবং কেশবের ব্রহ্ম যে অভেদ বারেবারে কেশবচন্দ্রের মনে এই ধারণা তৈরি করে দিয়েছিলেন ঠাকুর। বলেছিলেন, ‘আমি মাটির বা পাথরের কালী মনে করি না। চিন্ময়ী কালী।

যিনি ব্রহ্ম তিনিই কালী। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন 'ব্রহ্ম', যখন সৃষ্টি-স্থিতি- প্রলয় করেন তখন কালী অর্থাৎ তিনি কালের সঙ্গে রমন করেন।' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, অখণ্ড সংস্করণ, পৃ. ১০৭৭)। ঠাকুর ব্রহ্মানন্দকে একথাও বলেছিলেন, ''তোমরা যাঁকে ব্রহ্ম বল, তাঁকেই আমি শক্তি, আদ্যাশক্তি বলি। যখন বাক্য-মনের অতীত, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় তখন বেদে তাঁকে ব্রহ্ম বলেছে। যখন দেখি যে তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন তখন তাঁকে শক্তি, আদ্যাশক্তি— এই সব বলি।'' (তদেব, পৃ. ৪৩৫)

ঠাকুরের এই ধর্মাদর্শ শুধু কেশবচন্দ্র নয়, কেশব-শিষ্যদের মনেও গভীর রেখাপাত করেছিল। যার অন্যতম প্রমাণ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বিস্ময়কর উক্তি, ''ক্ষণে ক্ষণে তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) কালীর কথা বলে থাকেন। কালীকে তিনি মা বলে ডাকেন। কালী মূর্ত শক্তি— ঈশ্বরীয় শক্তি— যা দেখা যায় নারী চরিত্রে ও প্রতিপত্তিতে। কালী প্রকৃতিস্বরূপা। তিনি সকল অত্যাচারীকে দমন করেন। তিনি তার স্বামীকে মাটিতে শায়িত করে তাঁর বুকের উপর চরণ স্থাপন করেন। তিনি সকল জীবকে মায়ামুগ্ধ করে জয় করেন। তাঁর যে-সব সন্তান তাঁর কাছে মা বলে আসে এবং তাঁর চরণে শরণ প্রার্থনা করে, তিনি তাদের মোক্ষ দান করেন ও রক্ষা করেন। প্রচণ্ড শক্তির বলে তিনি এ কাজ অব্যর্থরূপে সম্পাদন করেন। তাঁর মাতৃসুলভ আবেদন ভক্তদের হৃদয়ে সন্তানোচিত স্নেহ-অনুরাগ জাগিয়ে তোলে। রামপ্রসাদ সেনের অপূর্ব ভক্তিগীতির মধ্যে মায়ের জন্য সন্তানের যে ভাবাবেগ অভিব্যক্ত হয়েছে তা কালী-উপাসনার বাস্তবতা ও কার্যকারিতার বিস্ময়কর প্রমাণ।'' (শ্রীরামকৃষ্ণকে যেরূপ দেখিয়াছি, স্বামী চেতনানন্দ সম্পাদিত, পৃ. ৩৫১) একজন ব্রাহ্মের কালী সম্পর্কে এহেন দৃষ্টিভঙ্গী নিঃসন্দেহে তারিফ যোগ্য।

তাঁর প্রভাব কেশব ও অনুরাগীবৃন্দের ওপর যথেষ্ট পড়েছে বুঝেও ঠাকুর তাঁদের কালী মানার জন্য জোর করেননি। বরং কৌতুক-নেত্রে এঁদের মানস-পরিবর্তনকে হয়তো উপভোগই করেছিলেন। এনিয়ে একটি চমৎকার চিত্র ভাবীকালের পাঠক-পাঠিকাদের

জন্য রেখে গিয়েছেন কেশবশিষ্য ত্রৈলোক্যনাথ দেব, ''...কালীর মন্দিরে (দক্ষিণেশ্বরে) আরতি আরম্ভ হইল। আমার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল যে, একবার আরতি দেখিব। আমি তাঁহাকে (শ্রীরামকৃষ্ণ) বলিলাম, 'আপনার সঙ্গে গিয়া আজ কালীর আরতি দেখিব বড় ইচ্ছা হইয়াছে।' তাহাতে তিনি বলিলেন, 'তুই ব্রাহ্ম, কালীর আরতি দেখবি কি করে?' আমি বলিলাম, 'দেখতে দোষ কি? আপনি আসুন, একত্রে যাইয়া দেখিয়া আসি।'' তিনি বলিলেন, ''...তুই একলা গিয়া দেখিয়া আয়।'' আমি বলিলাম, 'আমি ব্রাহ্ম, যদি কেহ কিছু বলে, সেইজন্য আপনার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা।' তিনি কোনওপ্রকারে যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, 'তুই নীচে জুতা রাখিয়া উপরে গিয়া আরতি দেখিস, কেহ কিছু বলিবে না।' আমি তাঁহার আদেশমতো কার্য করিয়া আরতি দেখিয়া ফিরিয়া আসিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওরে কেমন দেখলি?' বলিলাম, 'বড় সুন্দর'।'' (তদেব, পৃ. ৩৯৩)।

একথা অনস্বীকার্য যে শ্রীরামকৃষ্ণের জগন্মাতা মা কালীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিলেন। সুতরাং কেশবচন্দ্র সেন রামকৃষ্ণ-প্রভাবে জগন্মাতাকে স্বীকার করে থাকলেও তা কালী-প্রভাব মুক্ত ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের 'পঞ্চাশতম সাংবৎসরিক' উৎসবে বেলঘরিয়ার উদ্যানবাটীতে কেশবচন্দ্রের ঘোষণা ছিল : 'নববিধানের মা পালনী শক্তি, অসুরনাশিনী, সন্তানপোষণী, হিন্দু বামাচারীর জন্মদায়িনী প্রকৃতির নহেন।' হিন্দুবামাচারী বলতে কেশব সেন ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। তাঁর বক্তব্যের স্থূল অর্থ করলে বলতে হয়, নববিধানের 'মা' হলেন দুর্গা, কালী নন। কিন্তু এহেন সরলার্থ গ্রহণযোগ্য নয় বলেই আমার ধারণা। কারণ প্রথমত নববিধানের মাতৃরূপে 'দুর্গা'কে স্বীকার করে নিলে হিন্দু পৌত্তলিকতার সামনে অসহায় আত্মসমর্পণই বোঝায়। দ্বিতীয়ত, শ্রীরামকৃষ্ণের মা-ও ছিলেন পালনীশক্তি, সন্তানপোষণী। সুতরাং নববিধানের 'মা' আর শ্রীরামকৃষ্ণের 'মা' এক হওয়া বিচিত্র নয়। বিষয়টি নিয়ে এককালে প্রচুর বির্তক হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে নববিধানের ব্রাহ্মরাও স্বীকার করে নেন, ''কালীকে মেনে নেবার কেশবচন্দ্রের সিদ্ধান্ত যেমন অস্পষ্ট, তেমনি তিনি যে মানেননি এমন প্রমাণও নেই। তবে শ্রীম'র বক্তব্য থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, যদি কালীকে মেনেই থাকেন কেশবচন্দ্র, তবে তার পেছনে রহস্য একটাই। চিন্ময়ী কালী ও নিরাকার ব্রহ্ম যে অভেদ— একথা রামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র দুজনেই মেনে নিয়েছেন।'' (প্রসঙ্গ : শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, প্রসাদ সেন, ধর্মতত্ত্ব, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন স্মারক সংখ্যা, বৈশাখ, ১৪০৫)।

রোমা রোলাঁ তাঁর 'রামকৃষ্ণের জীবন' বইতে একটি অতীব কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ দিয়েছেন, ''১৮৮৪ খৃস্টাব্দের ১ জানুয়ারি তারিখে কেশবচন্দ্র মা কালীর একটি নূতন মন্দির উদ্বোধনের জন্য শেষবারের মতো যান।'' ('রামকৃষ্ণের জীবন', অনুবাদ : ঋষি দাস, ওরিয়েন্ট সংস্করণ, পৃ. ১০৫)। উল্লেখ্য তার সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই কেশব মারা যান। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেদিন কোন কালীমন্দির উদ্বোধনে গিয়েছিলেন তা এতদিনেও উদ্ধার করা যায়নি।

এই তথ্যের সূত্রও উল্লেখ করেননি রোমা রোলাঁ। তবে গ্রন্থের লেখক রোলাঁ বলেই এহেন তথ্যের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলাটা বাতুলতা হবে। যদি জানা যেত ঠিক কোন কালীমন্দির উদ্বোধনে গিয়েছিলেন কেশব সেন, তবে নিশ্চিতভাবেই এককথায় বলা যেত তিনি কালী মেনেছিলেন। এত নিউজপ্রিন্ট খরচের দরকার পড়তো না। ☐

মহীয়সী কেশব জননী সারদাসুন্দরীদেবী

ইন্দিরা রায়

সারদাসুন্দরীদেবী ছিলেন নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পরম স্নেহধন্য কেশবচন্দ্র সেনের জননী। সারদাসুন্দরী দেবী ১৮১৯-এ হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুবয়সেই অর্থাৎ দশবছর বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন হুগলির গৌরিভার দেওয়ান রামকমল সেনের দ্বিতীয়পুত্র প্যারিমোহন সেনের সঙ্গে। বিবাহিত জীবনের প্রথমধাপ থেকে পরিণত জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত নানা অভিজ্ঞতা, সন্তানদের প্রতি স্নেহ ও তাদের কথা ও নানাবিধ কথা বলে গিয়েছিলেন, পরে সেটি লিপিবদ্ধ করেছিলেন যোগেন্দ্রপ্রসাদ। পরে তা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় ১৯১৩-য়, যেটি কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামীদের কাছে ঐতিহাসিক মর্যাদা পেয়েছিল। তাঁর আত্মকথা থেকে সে সময়ের একটা ছবি উঠে আসে।

নাবালিকা সারদাসুন্দরীর শ্বশুরবাড়িতে এসে সন্ত্রস্ত দিনগুলোর অভিজ্ঞতায় একটা কথা বুঝেছিলেন যে, মেয়েদের বড় হয়ে উপযুক্ত হবার পর বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করা উচিত। তিনি ছিলেন সেবাপরায়ণা। ছোট্ট মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে প্রবেশ করেই নৈতিক শিক্ষার বলে গুরুজনস্থানীয় শ্বশুর-শাশুড়ির সেবায় ব্রতী হয়েছিলেন। শিক্ষার অধিকার সে যুগে মেয়েদের দেওয়া হোত না বটে; কিন্তু সারদাসুন্দরীর সৌভাগ্য ছিল এই যে, তাঁর স্বামী এ ব্যাপারে উদার ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর সহধর্মিণী লেখাপড়া শিখুক। এ ব্যাপারে তিনি আত্মকথায় লিখছেন : 'আমার স্বামী একান্ত ইচ্ছা করিতেন যে, আমি লেখাপড়া করি। অন্যত্র শিখিবার কোনও সুবিধা ছিল না বলিয়া তিনি নিজেই আমায় রাত্রিতে পড়াইতেন। তাঁহার হাতের অক্ষর অত্যন্ত সুন্দর ছিল, তিনি নিজে লিখিয়া আমায় সেইরকম করিয়া লিখিতে বলিতেন। আমিও চেষ্টা করিতাম।'

সারদাসুন্দরীদেবীর স্বামী ছিলেন পরমভক্ত। হরিনাম ও পূজা করা ছিল তাঁর নিত্যকর্ম। প্রকৃতিপ্রেমী ও পশুপ্রেমীও ছিলেন। স্বামীর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল এবং স্বামীর বহুবিধ গুণের তিনি গুণমুগ্ধ ছিলেন, সে যুগে স্ত্রীর পক্ষে এমনটা পাওয়া ছিল দুর্লভ। কিন্তু সারদাসুন্দরীদেবীর জীবনে সে সুখ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। খুব অল্পবয়সে তিনি স্বামীহারা হন, যখন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের বয়স ছিল মাত্র তেরো/চোদ্দ। সংসারের বিষয়-সম্পত্তি ব্যাপারে এক বিষময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু কখনও সম্পত্তির জন্য লালায়িত হননি। তাঁকে

সারদাসুন্দরী

ও তাঁর পুত্রদের বিষয়আশয় থেকে বঞ্চিত করেন তাঁর দেবর। এতটুকু বিচলিত না হয়ে সন্তানদের সুশিক্ষা দিয়ে উপযুক্ত করেন। সেদিক থেকে বলা যায় তিনি এক আদর্শজননী। কারণ, তাঁর মতো নির্লোভ, উদার ও নিষ্ঠাবান ধর্মপ্রাণা মানসিকতায় তৈরি হয়েছিল সন্তানেরা। তিনপুত্র— নবীন, কেশব ও কৃষ্ণবিহারী সেন; তিনকন্যা হলেন ব্রজেশ্বরী, পান্না ও চুনী। সব সন্তানের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় স্নেহ থাকলেও কেশবের প্রতি বাৎসল্য বেশিমাত্রায় ছিল। কেশবেরও মাতৃভক্তি ছিল অশেষ। অসুস্থ অবস্থায় তিনি মার উদ্দেশে বলেছিলেন— 'মা, মা, তুমি আমার বড় ভাল মা, এরকম মা কে পায়, আমার যা কিছু ভাল সব তোমার কাছ থেকে পাইয়াছি।' কেশব সম্পর্কে সারদাসুন্দরী বলেছিলেন— 'আমার এই নিশ্বাসে কেশবের জন্ম, আমার রক্তে কেশবের দেহ, আমার নিশ্বাসে কখনও কেশবের অসুখ করিবে না। আমাকে তাঁহার কাছে যাইতে দাও।' কেশবের অসুস্থ থাকাকালীন অবস্থায় তিনি এই কথা বলেছিলেন।

পরমবৈষ্ণব পরিবারের পুত্র কেশব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসার ফলে যখন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন, তখনও ধর্মমতে উদার সারদাসুন্দরী গোঁড়া ছিলেন না। তাই তিনি মেনে নিয়েছিলেন। কেশবের কারণেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন ঠাকুরের পরম স্নেহধন্য। তিনি কেশবের সঙ্গে হাসতেন, নাচ ও গান করতেন। এমনকি একবার সংকীর্তনের পর সারদাসুন্দরীকে ঠাকুর বলেছিলেন,— 'দ্যাখ মা, তোর যত নাড়িভুঁড়ি নিয়ে পৃথিবীর লোকে এর পরে নাচবে। তোর এই ভাণ্ড থেকে এই ছেলে বেরিয়েছে।'

কেশবের মৃত্যুর পর দিব্যদৃষ্টিতে তিনি বহুবার পুত্রের দর্শন পেয়েছেন। পুত্র-কন্যাদের জন্য তিনি অত্যন্ত গর্ববোধ করতেন। সন্তানেরা ছিলেন মাতৃভক্ত ও ঈশ্বরভক্ত। শুধু তাই নয়, পুত্রবধূদেরও তিনি অতীব সুনজরে দেখতেন। কিন্তু তাঁর জীবনে নেমে এসেছিল একের পর এক আঘাত। আঘাতে ক্ষতবিক্ষত সারদাসুন্দরী তীর্থ পর্যটনে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থানে তিনি গেছেন। লিখতে বা পড়তে না পারা এই মহিলা শেষবয়সে নিজের জীবনের কথা এত সুন্দরভাবে বলে গেছেন, তার মধ্য দিয়ে জীবনের ছবি আঁকা হয়েছে। যে কারণে কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামীরা তাঁর বলা কথা লিপিবদ্ধ করে শ্রদ্ধাকারে প্রকাশ করার পর এই গ্রন্থকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। গ্রন্থ প্রকাশের আগে তা তৎকালীন 'মহিলা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আত্মকথায় তিনি যা বলেছিলেন, তা এক জীবনদর্শনের কথা। আধ্যাত্মিকভাবে বিমোহিত সারদাসুন্দরী সংসারচক্রের আবর্তে কীভাবে ভগবান তাঁকে রেখেছেন, তা নিজেই জানিয়েছেন : 'ভগবান আমাকে একেবারে আনন্দে কিম্বা একেবারে দুঃখে থাকিতে দিতেছেন না। সুখে এবং দুঃখে তিনি আমায় পোড়াইতে পোড়াইতে সুখ-দুঃখের বাহিরে যাইতেছেন। আমার এক অংশ যেমন রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী, আর এক অংশ গৃহশূন্য অর্থহীন, প্রায় পথের ভিখারী, সুতরাং সুখসংবাদেও আমি উতলা হই না এবং দুঃখের সংবাদেও আমাকে কাতর করিতে পারে না। এই সমস্ত লীলাময় হরির খেলা মনে করি, এখন এই প্রকাণ্ড পরিবারের মধ্যে বসিয়া, ভাই, এক চোখে হাসি আর এক চোখে কাঁদি।' এই অংশের মধ্যে তাঁর প্রতিভারও কিঞ্চিৎ প্রমাণ মেলে।

তথ্যসূত্র : ফিরে দেখা-২, সুবর্ণরেখা প্রকাশন।

চিঠিপত্র

একি হাল আজ পশ্চিমবঙ্গের !

সকাল বেলায় খবরের কাগজ আর পড়তে ইচ্ছে করে না। লজ্জা ঘেন্না করে পড়তে। প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা অবধি কেবল খুন আর ধর্ষণ যেন সিংহভাগ জুড়ে থাকে। কেউ যদি ঠাট্টার ছলে পশ্চিমবঙ্গকে ‘ধর্ষণ নগরী’ বলে ফেলেন— সেটা কি, খুব একটা অন্যায় হবে? একে তো মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা। আবার তাঁরই হাতে স্বরাষ্ট্রদপ্তর। শ্রীমতী মমতার রাজত্বে যেন ধর্ষণের বাড়বাড়ন্ত।

মাননীয় অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে লালকৃষ্ণ আদবানী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েই ঘোষণা করেছিলেন ‘ধর্ষণ করলেই ধর্ষণকারীর শাস্তি হবে— ফাঁসি।’ তিনি হচ্ছেন প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। ভবিষ্যতের শোচনীয় অবস্থার কথা চিন্তা করেই ফাঁসির হুকুম জারি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তথাকথিত প্রগতিবাদীদের প্রতিবাদের ফলে আর আইনে পরিণত হতে পারেনি।

একজন ধর্ষণকারীর ফাঁসি হলেই সারা ভারতবর্ষে ধর্ষণ চিরতরে বন্ধ হয়ে যেত। মাতৃজাতির সম্মান রক্ষিত হোত। তাঁরা দেশের সর্বত্রই আত্মসম্মানের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে পারতেন।

কিন্তু এ কি হাল আজ পশ্চিমবঙ্গের? ৩/৪ বছরের শিশু কন্যা থেকে ৭০ বছরের বৃদ্ধাও ধর্ষণের হাত থেকেও ছাড় পাচ্ছে না। এর কি কোনও বিচার নেই?

—**হিতেন্দ্র কুমার ঘোষ, কল্যাণী, নদীয়া।**

স্ত্রীকে বেতন?

কথায় বলে, ‘নেই কাজ তো খই ভাজ।’ কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকার ইদানীং সেই অকাজেই হয়েছে ব্রতী। এমনিতেই সরকার বসে আছে দুর্নীতি-কেলেঙ্কারীর চূড়ায়। প্রায় প্রতিদিনই একটা না একটা দুর্নীতি বা কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ছেন মন্ত্রিমশাইদের কেউ না কেউ। তাই ইউপিএ ও ‘করাপশন’ সমার্থক। অনেকে এখন United Progressive Alliance (সংযুক্ত প্রগতিশীল মৈত্রী)-কে ঠাট্টা করে বলেন— United Plunder's Alliance (সংযুক্ত লুঠেরাদের মৈত্রী)।

এহেন এক লুঠপাটের সরকারের মন্ত্রিসভা জনগণের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে সংসদে একটি প্রস্তাব আনতে যাচ্ছে। প্রস্তাবটি এরূপ : স্বামীর বেতনের একটি অংশ প্রতিমাসে তার স্ত্রীকে ‘বেতন’ বাবদ দিতে হবে গৃহকর্মের নিমিত্ত। হঠাৎ এই ‘খই ভাজা’র কারণটা কী? না, ভারতের জাতীয় আয় নাকি এখন তলানিতে। তাই জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি-হার বাড়াতে এখন ‘উর্বর মস্তিষ্কওয়ালা’দের এই পরিকল্পনা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় এহেন আইন (যদি প্রস্তাব বা পরিকল্পনাটি আইনে পরিণত হয়) কতটা প্রযোজ্য? তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, একমাত্র ভারতীয় সমাজে বিশেষত হিন্দু সমাজে একদা নারীজাতি ছিল সম্মানের উচ্চাসনে। সমাজ গঠনে নারীদের অবদান আজও আমরা স্মরণ করি। গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপলা, বিশ্ববারা, অরুন্ধতী, অনসূয়া, খনা, প্রিয়ংবদা প্রমুখ ছিলেন দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ ও শাস্ত্রকারিণী। সাবিত্রী, দ্রৌপদী, সতী, অহল্যা, সীতা, শৈব্যা প্রমুখ ছিলেন পতিব্রতা। কন্নগী, দুর্গাবতী, লক্ষ্মীবাঈ, অহল্যাবাঈ, চন্নম্মা, রুদ্রমাম্বা প্রমুখ ছিলেন বীরাঙ্গনা। মীরাবাঈ ছিলেন ভক্তিমতি। ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন সমাজসেবিকা। মা সারদা ছিলেন মাতৃস্বরূপা দেবী।

কাজেই যাঁরা দেশ ও সমাজের জন্য নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন হাসিমুখে, সেই ভারতীয় হিন্দু নারী তথা স্ত্রীদের ‘মাইনে করা বাঁদী’তে পরিণত করার চক্রান্ত চলছে। চক্রান্তকারীদের মনে রাখা উচিত, এদেশের নারীরা আর যাই হোক পাশ্চাত্য নারীদের ন্যায় ‘ভোগ্যপণ্য’ নয়। একমাত্র হিন্দু ধর্ম ও সমাজে এক স্বামী ও এক স্ত্রী রীতি প্রচলিত আছে। স্বামী স্ত্রীকে ধর্মপত্নী ও অর্ধাঙ্গিনী মনে করে। বহুক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, পীড়িত, অক্ষম ও কপর্দকহীন স্বামীকেও স্ত্রী ত্যাগ করে না। সুখে-দুঃখে থাকে চিরসাথী হয়ে। হিন্দু নারীরা পুরুষের শুধু ভোগের সামগ্রী নয়, বরং সুসন্তান জন্মদাত্রী মা। হিন্দু সমাজে অধিকাংশ স্বামী স্ত্রী বিয়োগের পর নতুন করে আবার দ্বারপরিগ্রহ করে না। বিপরীতক্রমে বিধবা নারী নতুন স্বামীর ঘর করতে যায় না। বিশ্বে এসব ঘটনা বিরল।

“সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।”— একথা হিন্দু সমাজের নারীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সমাজে এমনও অনেক স্বামী আছেন যাঁরা সারামাসের উপার্জনের বা বেতনের টাকা স্ত্রীদের হাতে তুলে দেন। স্ত্রীরা সংসারে উদয়াস্ত বিনাপারিশ্রমিকে খেটে চলেন সংসার, স্বামী, সন্তান ও নিকটাত্মীয়দের সুখ-শান্তির জন্য। এটাকে তাঁরা সেবা ও সংসারের প্রতিকর্তব্য বলে মনে করেন। কোন মূল্যে এর বিচার চলে? একজন বেতনভুক পরিচারিকা কোনও সংসারে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ করেন। আর একজন স্ত্রী নিঃস্বার্থভাবে সংসারের উন্নতি ও অগ্রগতির স্বার্থে বিনা বেতনে কাজ করেন। স্ত্রীদের যদি তাঁদের কাজের জন্য বেতন দিতে হয় তাহলে পরিচারিকাদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য রইল কোথায়? পাশ্চাত্য সমাজে দৈহিক ক্ষুধা মেটানোর জন্য নারী ভাড়া নেওয়ার রেওয়াজ আছে। মেয়াদ শেষে ভাড়া মিটিয়ে তাকে বিদায় করে দেওয়া হয়। মুসলিম সমাজেও বহু স্ত্রী গ্রহণ ও তালাক দেওয়ার রীতি আছে।

কিন্তু হিন্দু সমাজে স্ত্রী শুধু সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র নয়, সে একাধারে স্ত্রী ও অন্যদিকে জননী। কিন্তু হিন্দু বিদ্বেষী ও দেশদ্রোহী কংগ্রেস জাতীয় আয় বৃদ্ধির নামে ও ভোটের স্বার্থে স্ত্রীদের পরিচারিকা বানানোর চক্রান্ত করছে।

—**ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।**

এলাহাবাদ পূর্ণকুম্ভের জন্য প্রকাশিত হল

প্রয়াগ পূর্ণকুম্ভ

— লাল ঠাকুর

—: প্রাপ্তিস্থান :—

ঘোষ এন্ড চক্রবর্তী

(পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলারস্)

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলকাতাঃ৭০০ ০৭৩

ফোন - ৯৭৪৯৪৩৮৪৮৮

Anil Kr. Bhalotia

Property Consultant

689, Lake Town, Block - A

Kolkata -700089

(Near Hollywood Dry Cleaner)

Ph : 9330026410 (M)

9339364060 (R)

9230618818 (M)

শুভ দীপাবলীর প্রীতি ও
শুভেচ্ছা সহ—

—এন এল সিংহানিয়া

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

মনীষী ও দেশসেবকদের স্মরণ

রণজিৎ সিংহ

মনীষী ও দেশসেবকরা যে-কোনও দেশ ও জাতির অগ্রগণ্য। তাঁরাই দেশ ও জাতিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলেন— মেধা ও মুক্তির পথ দেখান। তাই তাঁদের স্মরণ দেশবাসীর অবশ্য কর্তব্য এবং কৃতজ্ঞতার যথার্থ প্রকাশ। স্বাধীন ও পরাধীন দেশে এই পূজার মাপকাঠি ভিন্ন হতে পারে না।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলায় সামাজিক ভেদাভেদের বন্ধন উন্মোচন করেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁর 'হরিনামের' সংকীর্তনে বাংলায় এক অদ্ভুত জাগরণ ঘটে যায়। বঙ্গবাসী নিজেদের স্বরূপ উপলব্ধি করে। তারপর অনেকদিন কেটে যায়। বাংলা তথা ভারত ইংরেজ শাসনে চলে আসে। দেশ পরাধীন হয়।

পরাধীন দেশে স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তা প্রথমে আনেন রাজা রামমোহন রায়। বলেন, "Enemies to Liberty and friends of Despoticism will never and never be ultimately successful." অর্থাৎ "স্বাধীনতার শত্রুরা ও স্বৈরাচারের বন্ধুরা কখনও শেষ পর্যন্ত সফল হবে না!" তারপর একে একে আসেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রমুখেরা, যাঁরা বাঙালীর সারস্বত সাধনা ও আধ্যাত্মিক চেতনাকে নব নব ভাবে সঞ্জীবিত করেন। আরও একটু পরে শিক্ষাক্ষেত্রে 'বাংলার বাঘ' নামে পরিচিত আশুতোষ, তাঁর সুযোগ্য সন্তান ভারত-কেশরী শ্যামাপ্রসাদ, দেশগৌরব নেতাজী সুভাষের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। বাংলা তথা ভারতের পরাধীনতাকালে এঁদের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা। কোনও বিস্মরণের অবকাশ নেই! আর আছেন 'মরণ সাগর পারের অমর' বিপ্লবীরা— ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল, মাস্টারদা সূর্য সেন, প্রীতিলতা, কল্পনা প্রমুখেরা। এঁদের বাইরে দেশ ও জাতির সেবায় নিবেদিত অনেক গুণী মানুষজন আছেন, যাঁদের নাম স্বল্প পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব নয়!

আজ বাংলা তথা ভারত স্বাধীন। ভারত স্বাধীন। ভারত তার স্বাধীনতার ৬৪ বছর পার করেছে। তাই আজ প্রয়োজন দেশের মুখোজ্জ্বলকারী এই সকল অসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত এবং পরাধীনতা মোচনকারী সন্তানদের স্মরণ ও মনন— তাঁদের জীবন, মনীষা ও বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। এই স্মরণ হবে আপামর দেশবাসীর এই সকল মহৎজীবনের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও বিনম্র শ্রদ্ধা। এখানে ভেদাভেদের প্রশ্ন নেই! প্রত্যেক মনীষী ও অগ্নি-সন্তানদের প্রতি সমান পূজা নিবেদিত হওয়া উচিত। এর বৈপরীত্য অকৃতজ্ঞতা ও হীনমন্যতার পরিচায়ক।

গত বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকে বাংলা তথা ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসাধারণ তেজোদীপ্ত একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন 'যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান' শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন এবং নানা দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন করেন। তিনিই প্রথম বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে বাংলায় ভাষণ দেবার জন্য অনুরোধ করেন এবং কবি এই আহ্বানের মান্যতা দেন। তারপর থেকে কোনওদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে বা সমাবর্তনে বাংলায় ভাষণ হয়নি! সেই সময় তিনি ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় মন্ত্রীর দায়িত্ব অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন। আবার প্রয়োজনে সেই মন্ত্রীত্ব অবহেলায় পরিত্যাগ করেন। মেদিনীপুরের বন্যার্ত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে সমব্যথী হন। তারপর নেতাজীর অন্তর্ধানে বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চে তিনিই হয়ে গেলেন পথদিশারী, প্রিয় নেতা।

এবার ইংরেজদের ভারত ছাড়ার পালা। ভারতের ভেতরে-বাইরের (নেতাজীর আজাদ হিন্দু ফৌজের দুরন্ত অভিযান) আন্দোলনে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতের শাসনভার ভারতবাসীদের হাতে দিতে মনস্থকরণ। কিন্তু সেখানেও চক্রান্ত। শাসকগোষ্ঠী সমগ্র বাংলা ও পাঞ্জাবকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইল। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের যুক্তি ও তথ্যের কাছে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী পরাজিত হয়ে বাংলা ও পাঞ্জাবকে দ্বিখণ্ডিত করে পশ্চিমবাংলা ও পশ্চিম পাঞ্জাবকে ভারতের সঙ্গে রাখতে বাধ্য হলো। ভারত স্বাধীন হলো। এখানেই শেষ নয়। ভারতের অখণ্ডতা বজায় রাখতে—কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত রুখতে জম্মুতে রহস্যময় পরিবেশে কারাগারে ভারতমাতার বীর সন্তান শ্যামাপ্রসাদ মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে প্রয়াত হলেন।

আজ দেখতে দেখতে স্বাধীনতার ৬৪ বছর কেটে গেল। কিন্তু এই মহৎ জীবনের পরিচয় তুলে ধরবার এবং বর্তমান প্রজন্মকে জানানোর কোনও উদ্যোগ সরকারি ও বেসরকারি স্তরে দেখা যায় না! দেশ ও জাতির সেবায় নিবেদিত এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে ইতিহাসের অন্ধকারে নিক্ষেপ করার সবরকম প্রচেষ্টাই আজ অত্যন্ত সক্রিয়। এখন 'পরিবর্তনের সরকার' চলছে পশ্চিমবঙ্গে। দেখা যাচ্ছে হঠাৎ করে সরকার চালানোর মূল কেন্দ্র— মহাকরণে মনীষী ও দেশসেবকদের স্মরণ হচ্ছে। কিন্তু গভীর বেদনার বিষয়, একদিনের জন্যেও এই মহৎ ব্যক্তিকে স্মরণ করা হয়নি এখানে আজও। যাঁর দৌলতে এখানে ৬৪ বছর ধরে বিভিন্ন দল, ফ্রন্ট, আজকের 'পরিবর্তনপন্থীরাও' ক্ষমতা ভোগ করছেন, তাঁদের মুহূর্তের জন্যে এই 'দেশ প্রাণকে' সামান্য 'শ্রদ্ধা' জানাতেও দেখা যাচ্ছে না! এই ঘেরাটোপের বাইরে অন্যত্রও শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে কোনও অনুষ্ঠান হতে দেখা যায় না! সম্প্রতি কলকাতার বাইরে একটি মিউনিসিপ্যাল এরিয়ায় গিয়ে দেখি সেখানের মূল বড় রাস্তায় দেশের জাতীয় নেতাদের সঙ্গে সংস্কৃতি জগতের ব্যক্তিদেরও ছবি টাঙানো হয়েছে। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদকে এই ছবির সমারোহে খুঁজে পেলুম না! বুঝলুম এই ছবির প্রদর্শনী উদ্দেশ্যপূর্ণ ও সংকীর্ণ। কিন্তু এই ভাবে দেশ ও জাতির প্রতি এই মহাপ্রাণের অবদানকে মুছে ফেলা যাবে না! তাই বলি 'মনীষী ও দেশসেবকদের স্মরণ' হোক্ স্বচ্ছ, উদার, নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। তখনই মহতের বন্দনা সার্থক হবে। আমরা নিজেরাও হবো ধন্য। ☐

সমাবেশ সমাচার

এক মাসে বাংলার পনেরোটি স্থানে সংস্কৃত ভারতীর শিবির

বাংলার পনেরোটি স্থানে গত একমাসে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলা শেখার জন্য পনেরোটি সম্ভাষণ শিবির করল সংস্কৃত ভারতী। সব মিলিয়ে প্রায় ৭৫০ জন শিক্ষার্থী খুব উৎসাহের সঙ্গে শিবিরগুলিতে অংশগ্রহণ করেন। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিদের সংস্কৃত শেখার শিবিরগুলিতে অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো।

শিবিরগুলি হয়েছে যথাক্রমে দক্ষিণবঙ্গের নদীয়ার কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, উত্তর চব্বিশ পরগণার পলতা, পাঁশকুড়ার রামকৃষ্ণ মিশন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কাকদ্বীপ, গোসাবা, হুগলীর সিঙ্গুর, কলকাতায় দক্ষিণেশ্বর ও আলিপুর এবং উত্তরবঙ্গের মালদহ, ইটাহার ও রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয় ইত্যাদি স্থানে।

প্রত্যেক শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন। কোথাও ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক, কোথাও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, কোথাও বা স্থানীয় অধ্যাপক কিংবা প্রধান শিক্ষক। প্রত্যেক বক্তাই আগামী ভবিষ্যৎ নির্মাণে ভারতের সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সংস্কৃত পঠন ও পাঠনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয়ে সংস্কৃত আবশ্যিক করার জন্য বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

ভারতে 'সংস্কৃতভাষা' ও 'মর্যাদা' সমার্থক যিনি কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন সেই মহান কর্মবীর যুবনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের দেড়শো বছরে সংস্কৃত ভারতী বাংলায় সম্ভাষণ শিবির অভিযান তথা বিভিন্ন স্থানে সাইকেল শোভাযাত্রা ও বর্ষব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রমের আয়োজন করেছে বলে সংস্কৃত ভারতীর কলকাতা কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে।

মহালয়া কার্যক্রম

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও শুভ মহালয়ার প্রভাতে তর্পণ কার্যক্রম হলো— উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ খণ্ডের কাহালই নদীতে। মন্ত্র পাঠের সঙ্গে সকলে স্নান করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সঙ্ঘের প্রচারক মটুকেশ্বর পাল। মহালয়ার তাৎপর্যসহ স্বামীজীর সার্ধশত জন্মবর্ষে আমাদের করণীয়, দেশের এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে সঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা তুলে ধরেন সকলের কাছে। প্রায় ৫০০ জন উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ প্রদীপ অধিকারী, জেলাসঙ্ঘচালক জগদীন্দ্রনারায়ণ সরকার, জেলা কার্যবাহ বিশ্বরূপ কুণ্ডু, বিভাগ প্রচারক সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরীসহ অন্যান্য কার্যকর্তা। সমগ্র কার্যক্রম পরিচালনা করেন খণ্ড কার্যবাহ অসীম দাস।

সাইকেল শোভাযাত্রা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ শাখার আসন্ন বিবেকানন্দ যুবশিবির উপলক্ষে উলুবেড়িয়া নগরে মহালয়ার দিন একটি সাইকেল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। তাতে অংশগ্রহণ করেন পাঁচটি মোটর সাইকেলসহ ৪০ জন সাইকেল আরোহী।

'দেবদূত'-এর বস্ত্র বিতরণ

কলকাতায় বাগবাজারে 'দেবদূত' নামে একটা বেসরকারি সংস্থা প্রতি বছরের মতো এবছরও শারদীয়া দুর্গোৎসব উপলক্ষে সমাজের আর্থিক পিছিয়ে পড়া অবহেলিত শিশুদের (পথশিশু) মধ্যে নতুন বস্ত্র বিতরণের এক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। শ্রীশ্রী ঠাকুরের পদধূলি ধন্য বাগবাজারের বলরাম মন্দিরের সামনে গত ১৪ অক্টোবর রবিবার সকালে এই অনুষ্ঠান হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী মন্ত্রাত্মানন্দ মহারাজ। প্রধান অতিথি হিসেবে সুবীর রায়, বিশেষ অতিথি হিসেবে সঞ্জয় ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে সাড়ে তিনশোরও বেশি শিশুর মধ্যে নতুন জামা বিতরণ করা হয়। কোনও সরকারি সাহায্য ছাড়াই শুধুমাত্র সংস্থার সদস্যদের সহযোগিতায় এই ধরনের সেবা কাজ এলাকার বিশিষ্টদের প্রশংসা পায়।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংস্থার সম্পাদক জয়ন্ত সেন ও সহ সম্পাদক শৈলেন পাল। অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শশাঙ্কশেখর দে।

পরলোকে অসীম গঙ্গোপাধ্যায়

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিজয়গড় শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক এবং সঙ্ঘের কলকাতা মহানগরের দক্ষিণভাগ সঙ্ঘচালক অসীম কুমার গঙ্গোপাধ্যায় গত ১৪ অক্টোবর রাত্রি ৩টা ১০ মিনিটে বেসরকারি হাসপাতালে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বৎসর। রেখে গেছেন স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়স্বজন এবং বহু গুণমুগ্ধ বন্ধু।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। বাপুজীনগর বালক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। সারা দক্ষিণ কলকাতায় অঙ্কের শিক্ষক হিসেবে তাঁর খুবই সুনাম ছিল। এলাকার অনেক গরীব ছাত্রকেও তিনি নিঃশুল্ক পাঠদান করেছেন। প্রয়াত গোখলেজী পঞ্চাশের দশকে যখন সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে ওই এলাকার কাজ দেখতেন তখনই তিনি সঙ্ঘের সান্নিধ্যে আসেন। শাখার মুখ্যশিক্ষক কার্যবাহ থেকে মহানগর বৌদ্ধিক প্রমুখের দায়িত্ব পালন করেছেন কৃতিত্বের সঙ্গে। বাঘাযতীন থেকে গড়িয়া, বাঁশদ্রোণী, রাণীকুঠিতে শাখার কাজে পায়ে হেঁটে নিয়মিত যাতায়াত করেছেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেছেন। পূজনীয় বালাসাহেব দেওরস এবং সদ্যপ্রয়াত পঞ্চম সরসঙ্ঘচালক শ্রী সুদর্শনজীও তাঁর বাড়িতে উঠেছেন। যাঁরা মহানগরে প্রচারক হিসেবে কাজ করেছেন— মাননীয় কেশবজী, প্রয়াত বংশীলাল সোনী, রামদা (রামচন্দ্র সহস্রভোজনী), প্রয়াত মনোজ ঘোষ (প্রথম মুখ্যশিক্ষক), সুনীলপদ গোস্বামী, এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে কাজ করেছেন। এছাড়া যাঁরা স্থানীয়ভাবে প্রচারক ছিলেন, তাঁদের তিনি তো এককথায় অভিভাবক। একান্নবর্তী পরিবারে সকলের শরীর-স্বাস্থ্য এবং ছোটদের লেখাপড়ার দিকে তাঁর বিশেষ নজরে থাকত।

একসময় বিদ্যার্থী পরিষদের কাজে তাঁর সক্রিয় যোগদান ছিল। তাঁর চেষ্টায় অনেক প্রতিষ্ঠিত নাগরিক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হয়েছেন। তাঁর অকালপ্রয়াণে একজন দেশব্রতী সত্যিকার স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তাকে আমরা হারালাম। নিতান্ত অসুস্থ না হলে কয়েকজনকে জাগিয়ে ডাক দিয়ে প্রভাত শাখাতে আসতেন। পরে, যারা এল না তাদের খোঁজে বেরোতেন।

বিগত দু'-তিন বছর যাবৎ মেরুদণ্ডে টিউমার হওয়াতে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। অদম্য মনের জোর নিয়ে হাসিমুখে সবার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। ১৫ অক্টোবর সকালে কেওড়াতলায় তাঁর শেষকৃত্যানুষ্ঠানে সঙ্ঘের প্রদেশের অনেক কার্যকর্তাসহ বহু স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন। আগামী ১১ নভেম্বর বিকেলে বাঘাযতীন পাবলিক হলে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবে।

বেহালায় বুক স্টল

প্রতি বছরের মতো এ বছরও কলকাতার জমিদার সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের আদি বাড়ি বড়িষা-ডায়মন্ডহারবার রোডের উপর, সৃষ্টি-সহযাত্রী পূজা প্রাঙ্গণে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষে ২০ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর (মহাষষ্ঠী থেকে বিজয়া দশমী) পর্যন্ত একটি বুক স্টল দেওয়া হয়েছিল। প্রতিদিন বিকাল চারটা থেকে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত স্টলটি খোলা ছিল। বহু ক্রেতা এই স্টল থেকে জাতীয়তাবাদী পুস্তক সংগ্রহ করেছেন।

সম্প্রতি শিলিগুড়ির আর এস এস কার্যালয় মাধব ভবনে বাংলায় সঙ্ঘের প্রথম সঙ্ঘচালক প্রয়াত কেশবচন্দ্র চক্রবর্তীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাচক্রে নৃত্যানুষ্ঠান।

রক্তদান শিবির

তাঁতিবেড়িয়া স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সমিতির উদ্যোগে গত ৭ অক্টোবর রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশু মন্দির প্রাঙ্গণে। শিবির উদ্বোধন করেন ধনঞ্জয় ঘোষ ও প্রফুল্ল ঘোষ। রক্তদান করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা। রক্ত সংগ্রহ করেন কলকাতার লাইফ কেয়ার, রক্তসংগ্রাহক প্রতিষ্ঠানটি।

বর্ণয়াল আয়ুর্বেদ ভবন

উখরা, বর্ধমান-৭১৩৩৬৩

ব্রেনটিউমার, ব্রেস্টটিউমার, ফ্রাইবয়েডইউটেরিয়াস, শ্বেতী, সোরাইসিস্ চর্মরোগ, পেটের রোগ, চুলের রোগ, সুগার, কিডনী রোগ, হাঁপানী, বাত, ব্যথা ও স্ত্রী রোগের স্থায়ী চিকিৎসা।

Dr. Arun B. Chakraborty

B.A.M.S., *Ayurved Ratna Physician & Botanist*

M/O. *Patanjali Ayurved Chikitsalaya*

Mobile-9332205341, 9832791541

দ্য মাল্টিস্টেট কো-অপারেটিভ সোসাইটি মাইক্রো ফিনান্স-এর জন্য প্রতিটি থানা ও শহরে একটি করে শাখা খোলার জন্য ব্রাঞ্চ-অফিসার এবং প্রচুর কর্মী চাই।

—: যোগ্যতা :—

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার-স্নাতক

—: এজেন্ট এবং টিমলিভার :—

মাধ্যমিক এবং অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে

বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ।

—: যোগাযোগ :—

৯৮০০৯৫২৬৯৬, ০১১২৫৮১৩৪২৬

Email : Jobs.mslub@gmail.com.

যোগাযোগের সময় : সকাল ১০টা—রাত ৭টা পর্যন্ত।

দীপাবলীর প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ :

DEE PEE BLOCK BOARD PVT. LTD.

—ঃ সৌজন্যে ঃ—

Dipayan Chatterjee

SATYA NARAYAN ACADEMY

C.B.S.E. AFFILIATED HIGHER SECONDARY
RESIDENTIAL CO-EDUCATIONAL WITH
SCIENCE & COMMERCE STREAM
BOOK YOUR SEAT IMMEDIATELY.

CAMPUS AT : RAMAKRISHNA NAGAR
BANKURA - 722155

CONTACT - 9433175048 / 9732063765

ADVT.

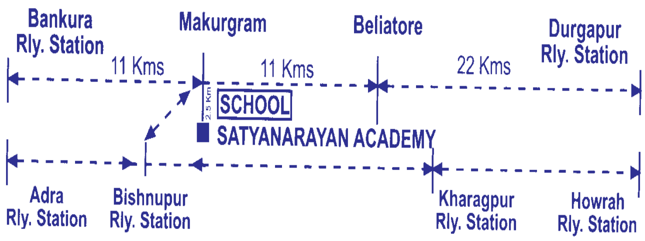

ফোঁটা এবার ফেসবুকে

প্রিয় পাঠক,

আশা করি, চড়া বাজার আর পকেট ফাঁকা নিয়ে পুজো থুড়ি শারদীয়া উৎসব ভালই কাটিয়েছেন সক্কলে। তবে রাজনীতিকদের পুজোটা ভাল কাটলেও পুজোর পরটা মোটেও ভাল কাটল না। তবে আপাতত একটা বিষয় ঠিক হয়ে গেছে যে এবার ফোঁটা হবে ফেসবুকে। দিদি সব বিষয়ে যখন ফেসবুকে ফেস দেখাচ্ছেন তখন ভাইদের ফেসে ফোঁটা দিতে নিশ্চয়ই ওই ফেসবুককে বুক করে রেখেছেন।

এই যে পুজোটা গেল। তাতে পঞ্চমী পর্যন্ত দিদি সমস্ত টিভির এয়ার টাইম দখল করেছিলেন। আর ষষ্ঠী থেকে ফেসবুকের ভরসায় আলোয় থেকে গেলেন। মায়ের আলোয় ভাগ বসালেন। ষষ্ঠীতে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী জয়রাম রমেশের চিঠি, সপ্তমীতে যশ চোপরার মৃত্যু, মাঝে অষ্টমীতে ছুটি নিয়েই ফের দশমীতে বিজয়ার শুভেচ্ছা। সবকিছুতেই মুসলিম ভাইদের কিন্তু ভোলেননি। একেবারে দিদি থামলেন ঈদ মুবারক জানানোর পর। কিন্তু আমার একটা আপশোস রয়ে গেল। পয়লা নভেম্বর মহাকরণের অলিন্দে ব্র্যান্ড ভাই শাহরুখের জন্মদিনটা পালিত হলো না। এমনকি দিদির ফেসবুকেও শুভেচ্ছা দেখা গেল না। এরই মধ্যে আবার এবিজে কেলেঙ্কারী হলদি নদীর জলে ডুবিয়ে দিয়েছে দিদি সমেত গোটা দলকে। এ ব্যাপারে সূর্যকান্ত মিশ্র যে বলছেন, 'ডককে ডকে তুলেছে তৃণমূল' এটাও মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু যেটুকু ডকে তোলার তা তাদের আমলেই যথেষ্ট হয়েছে। এখন শুধু মরার ওপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া হচ্ছে।

ওদিকে কংগ্রেসের হাল আরও খারাপ। রবার্ট বঢ়রা, সলমন খুরশিদ কাণ্ড এখনও জুড়োয়নি। এরই মধ্যে ঋণ কেলেঙ্কারি নিয়ে নতুন করে বিপর্যস্ত কংগ্রেস। পার্টির স্বীকৃতি বাতিলের দাবি করে জনতা পার্টি প্রেসিডেন্ট সুব্রহ্মণ্যম স্বামী শনিবার নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, অ্যাসোসিয়েটেড জার্নাল নামে এক সংস্থাকে কংগ্রেস বিনা সুদে নব্বই কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। কিন্তু রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপল অ্যাক্টের উনত্রিশ এ ধারা অনুযায়ী যেহেতু রাজনৈতিক দলগুলি করছাড়ের সুবিধে পায়, তাই তারা কোনওভাবেই কাউকে ঋণ দিতে পারে না। অতএব এই বেআইনি কাজের জন্য কংগ্রেসের স্বীকৃতি বাতিল করতে হবে। বিপাকে পড়ে অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালকে ঋণ দেওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছে কংগ্রেসও। তবে তাদের বক্তব্য, জওহরলাল নেহরুর প্রতিষ্ঠা করা অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালের অধীন ন্যাশনাল হেরাল্ড কাগজের সঙ্গে স্বাধীনতার আগে থেকেই তাদের সম্পর্ক। তার পুনরুজ্জীবনের জন্য ঋণ দিয়ে তারা কোনও মুনাফা করার চেষ্টা করেনি, বরং এটা তারা দেখছে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবেই। সরব বিজেপিও। তাদের বক্তব্য, নেহরু-গান্ধীর নাম করে ঋণ কেলেঙ্কারির সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করছে কংগ্রেস। এ ব্যাপারে যথাযথ তদন্ত করতে হবে। সুব্রহ্মণ্যম স্বামী তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ এনেছেন দাবি করে রাহুল গান্ধীর অফিস তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করার হুমকিও দিয়েছে। যদিও স্বামী তাতে মোটেই চিন্তিত নন। বরং তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার জন্যই রাহুলকে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, নিজের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করতে এতে তাঁর আরও সুবিধে হবে।

সুতরাং মন্ত্রিসভায় রদবদল করেও মনমোহন সিংয়ের সংসারে মোটেও শান্তি নেই। বরং দিন দিন তা বেড়েই চলেছে। নেহরুর কামরাজ থিয়োরি কাজে লাগিয়ে বেশ কয়েকজন প্রবীণকে পদত্যাগ করিয়েছেন। মনে হয়েছিল রাহুল গান্ধীকে ঢোকাবেন। কিন্তু এখনও সে সাহস দেখাতে পারলেন না। মনমোহন সিং যেদিন সাহস দেখাতে পারবেন সেই দিনটাকে অবশ্য সোনার অক্ষরে লিখে রাখবে এই দেশ।

— **সুন্দর মৌলিক**

All kinds of Timber, Plywood, Flash Door, Laminates Sunmica Glass & Interior Decoration

Shree Krishna Traders
4, Ram Sett Road,
Kolkata - 700 006
Phone : 2270-9452

Shree Dadu Ply House
41, C. R. Avenue
Kolkata - 700 012
Phone : 4008-5475, 2225-5470

পূজা ও দীপাবলীর শুভেচ্ছা সহ—

উমেশ গোয়েঙ্কা

পূজা ও দীপাবলীর শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন—

SHREE NURSING ELECTRIC STORES

With Best Compliments From :-

Tilak Transport Corporation
21, Mallick Street, 2nd Floor
Kolkata - 700 007

With Best Compliments From-

Mohan Kumar Kedia

জমি অধিগ্রহণ আইন পরিবর্তনের বিরুদ্ধে আর এস এস

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ২, ৩, ৪ নভেম্বর চেন্নাইয়ের উপকণ্ঠে কেলামবাক্কামে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী সভায় জমি অধিগ্রহণ আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন প্রতিনিধিরা। পাশাপাশি ওই সভায় সাম্প্রতিক অসম-দাঙ্গার পেছনে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের কালো হাতের কথা উল্লেখ করে সতর্ক করা হয়েছে কেন্দ্রকে। সভার প্রথমদিন ২ নভেম্বর সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ মনমোহন বৈদ্য এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণ আইন সংশোধনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে আর এস এস। জনজাতি, তফশিলী জাতি ও উপজাতিদের স্বার্থবিরোধী কোনও কাজের সঙ্গে আমরা নেই। শিল্প অথবা পরিকাঠামো উন্নয়নের নামে গরীবদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নেওয়ার বিরোধিতা সঙ্ঘ সর্বশক্তি দিয়ে করবে। বনের জমিতে থাকেন জনজাতিরা এবং এই ক্ষেত্রে তাই কোনও আপস কাম্য নয়।"

শ্রী বৈদ্য আরও বলেন, "শিল্প কিংবা অন্য উন্নয়ন কর্মসূচীর নামে জমি-অধিগ্রহণের পূর্ব-শর্ত শিথিল করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। বর্তমান আইন অনুযায়ী উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য জমি অধিগ্রহণ করতে হলে আশি শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের অনুমোদন লাগে। এই জায়গাটাই শিথিল করে আশির পরিবর্তে পঞ্চাশ শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের সম্মতি পেলে জমি অধিগ্রহণ করা যাবে বলে কেন্দ্র যে আইন সংশোধন করতে চাইছে তা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।"

অন্যদিকে, সাম্প্রতিক অসমের কোকরাঝাড়ে অশান্তির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদেরই যাবতীয় সমস্যার মূল বলে অভিহিত করে শ্রী বৈদ্য বলেন, "অসমের সাম্প্রতিকতম দাঙ্গাটি শুরু হয়েছিল বোড়ো উপজাতির চার যুবক সদস্য বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হবার পরই।

উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে অবৈধ বাংলাদেশী অভিবাসীদের বিপদ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে সতর্ক করে দিচ্ছে সঙ্ঘ। এই সমস্যা মীমাংসার ব্যাপারে চেন্নাই বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।"

প্রসঙ্গত, আর এস এসের বিভিন্ন প্রান্ত, ক্ষেত্র ও অখিল ভারতীয় অধিকারীদের নিয়ে এই রুটিন বৈঠক প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

কিন্তু এবছরই প্রথম অতি দক্ষিণ ভারতে অর্থাৎ তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাইয়ের উপকণ্ঠে প্রথমবারের জন্য এধরনের বৈঠক আয়োজিত হলো।

ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

শারদা ট্র্যাভেলস্

উলুবেড়িয়া, হাওড়া

প্রত্যুষ মণ্ডল– 9874398337 / 8820329463

❁ গ্যাংটক–নামচি–পেলিং–ইয়ুমথাং ❁ দার্জিলিং ❁ পুরী
❁ সিমলা–কুলু–মানালী ❁ কাশ্মীর ❁ ভাইজ্যাক–আরাকু
❁ দিল্লি–আগ্রা–মথুরা–বৃন্দাবন–হরিদ্বার–মুসৌরী
❁ কেরালা ❁ গোয়া ❁ মুম্বাই ❁ আন্দামান
❁ দেওঘর ❁ সুন্দরবন ❁ সিমলীপাল
❁ শিলং–চেরাপুঞ্জি–গৌহাটি

প্যাকেজ ট্যুরের জন্য যোগাযোগ করুন।

গুজরাটে হু হু করে বাড়ছে মোদীর জনপ্রিয়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মধ্য গুজরাটের বালাসিনোর গ্রামে মোদীর আসন্ন সভার জন্যে তৈরি বিশাল মঞ্চের তত্ত্বাবধান করছিলেন ওই এলাকার ভূতপূর্ব নবাবের পত্নী বেগম ফারহাত। সভা শুরুর আগে ২০০২-এর দাঙ্গায় মোদীর ভূমিকার পচনধরা, ঘ্যানঘ্যানে প্রশ্নটির উত্তরে সপাটে বললেন, ''আমিই এই সভার আয়োজন করে মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। ২০০২ ধুয়ে খেলে আর হবে না। একমাত্র পাগল ছাড়া কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষেরই খুঁত খোঁজবার দরকার পড়ে না যখন মোদী ৬ কোটি গুজরাটির মঙ্গলচিন্তক হিসেবে কথা বলেন। আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো পাতা ভরিয়ে যান। তাতে গুজরাটবাসীর কিছু যায় আসে না।'' হায়রে! এখনও তো মোদী মঞ্চেই ওঠেননি। গুজরাট ঘুরে দেখা গেছে গোধরা গপ্পে লোকের বিপুল অরুচি। তারা উন্নয়ন দেখেছে যেমন—

(১) গত ১০ বছরে সারা রাজ্যের কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির, যার গড় ১০.৯৭ শতাংশ, সারা ভারতের মধ্যে সর্বাধিক। (২) গুজরাটের সামগ্রিক উন্নয়ন মাপকাঠি চীনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দুই অঙ্ক ছাড়িয়ে গেছে। (৩) রাজ্যের সমস্ত শহরগুলি এবং গরিষ্ঠাংশ গ্রামাঞ্চল ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ পায়। (৪) আমেদাবাদের কাছে যে অটোমোবাইল হাব মোদী বানিয়েছেন তা সাফল্যের সব সীমা অতিক্রম করেছে। মানুষ বুঝেছে এগুলি ভোটে জেতার জন্য সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরি কোনও বাগাড়ম্বর নয়। কঠিন সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রকাশিত ও যথাযোগ্য (competent) সংস্থাগুলি দ্বারা অনুমোদিত। (৫) মোদী মানে যুবক- যুবতীদের ভবিষ্যতের আশা-ভরসা। এসব হৃদয়ে জারিত বিশ্বাসকে কি দু'দিন দিল্লী থেকে উড়ে এসে ছেলে-পুলে নিয়ে ঘুরে টলিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু কি এর রসায়ন? কোন যাদু দণ্ড আছে না কি? গুজরাট তো ভারতেরই অঙ্গ। হলে কি হবে, তফাৎটা উঠে এসেছে সমীক্ষায়। গুজরাটের কি শহর, কি গ্রাম সব কিসিমের নাগরিকরাই বলছেন— এটি একটি ত্রিফলা অস্ত্র— (১) মুখ্যমন্ত্রীর অদৃষ্টপূর্ব সততা (২) ভারতীয় রাজনীতিকদের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন দেখানোর চরম ব্যর্থতা এবং (৩) বিরল বিশ্বাসযোগ্যতা যা দেশের আর কোনও রাজনীতিকেরই পুঁজিতে নেই।

এই সুবাদে মোদী তাঁর ভোটার বলুন, রাজ্যবাসী বলুন, শ্রোতা বলুন তাঁদের সঙ্গে সরাসরি খোলা সাক্ষাৎকার করেন। যেমন এই সভায় করলেন। স্থানীয় ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে তখন তাঁর উপবাস ৯ দিনে পড়েছে। ওজন কমেছে ৫ কিলো। তিনি একটু জল খেলেন। যতটা না তৃষ্ণার পরিতৃপ্তির জন্য তার থেকে বেশি তার ক্ষুধার কিঞ্চিৎ নিবৃত্তির জন্য। ঠিক তাঁর 'কাউকেই তোষণ নয়, সকলের জন্যই ন্যায়' এই আপ্ত বাক্যে আস্থা প্রমাণ করতে।

এরপর তিনি মঞ্চে উঠলেন। চিরাচরিতভাবে নাটকীয় ভঙ্গীতে শুরু করলেন। সমবেত মানুষজন কিন্তু তাঁর উন্নয়নের কাণ্ডারীর পাশাপাশি এই নাটকেরও বাঁধা সমঝদার ও সমর্থক রসিক। উপস্থিত সোনিয়া গান্ধীর নাম উচ্চারিত হলো। অবশ্য বরাবরের মতোই গান্ধী নয় 'সোনিয়া বেহেন'। তাঁর এই সম্বোধনে গুজরাটের ক্ষেত্রে পুঁজিহীন সঙ্গতিহীন, রিক্ত, নিঃস্ব কংগ্রেস দলের এক মর্মন্তুদ রাজনৈতিক চিত্রপট ভেসে ওঠে। ''সোনিয়া বেহেন আজ রাজকোটে এসে নানান প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন। আপনারা কি বিশ্বাস করেন। তিনি সেসব পালন করবেন?'' সমস্বরের ব্যঙ্গাত্মক হুঙ্কার আছড়ে পড়ল 'না'। ''আচ্ছা, আপনারা কি ডঃ মনমোহন সিং বলে কারুর কথা জানেন? তাঁর বিগত ৮ বছরের রাজত্বকাল ভারতবর্ষকে কি দিয়েছে সে সম্পর্কে কিছু জানেন? আচ্ছা, গুজরাট যদি উন্নতি করতে পারে ভারতবর্ষ কেন পারবে না? আপনারা কি আপনাদের এই প্রিয় রাজ্যটিকে দুর্নীতির ছোঁয়াচে পাঁকে ডুবিয়ে দিতে চান, যেখানে কংগ্রেসের তৈরি মধ্যস্থতাকারীরা (Middlemen) আসবে?'' জনতা মোদীর আন্দাজ করা 'না' শব্দটির দ্বারাই আবার শব্দসীমা লঙ্ঘন করল। আসলে মোদীর সভাগুলিতে তিনিই একাধারে প্রচারক, গুরু, নিয়ামক এবং বক্তব্যের বিক্রেতা। সর্বোপরি নির্মল আনন্দ বিতরক। তিনি বললেন, ''তাঁর গুজরাট ছাড়া অন্য কিছুতে মাথা ঘামাবার নেই কেননা, তাঁর না আছে ছেলে না আছে জামাই''। কথাটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই বলা হলো কেননা এই নির্বাচনে মোদীর পক্ষে ব্যঙ্গ করার মতো কোনও স্থানীয় কংগ্রেসী নেতাই আজ অবশিষ্ট নেই। তারা উন্নয়নের তোড়ে আজ ঢাক ঢোল কাঁসী সমেত ভেসে গেছে। হিন্দুসভা নয় সর্বাধুনিক ফ্রেজ এখন মোদিসভা। যার মশলা মাত্র দু'টি, সু-শাসন ও নেতৃত্ব। এটি আজ মোদিতভাব সমার্থক। আবার এর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দুটিই 'সোনিয়া বেহেনে'র ভাঁড়ারে নিখোঁজ।

এই পটভূমিতেই গুজরাট বিধানসভা নির্বাচন আজ সর্বভারতীয় মাত্রা পেয়ে যাচ্ছে। গুজরাট আজ জাতির শাসন প্রণালীর পথপ্রদর্শকের আসনে। মোদীই হয়ে উঠেছেন সারা ভারতকে নেতৃত্ব দেওয়ার আদর্শ পুরুষ। সমীক্ষায় অংশ নিয়ে কর্পোরেট দুনিয়ার এক গরিষ্ঠাংশই আজ বলছে, ''মোদীর মতো স্বচ্ছ ভাবমূর্তির কেউ প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসলে ভারতের চেহারাই বদলে যাবে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সেটাই ঘটতে চলেছে।'' ইউনাইটেড নেশনসের এক ভূতপূর্ব আইন বিশেষজ্ঞ ইউ এন প্যাটেল বলেছেন, ''আজকের গান্ধীনগরে বসবাস করার সময় কেমন যেন মনে হয় পশ্চিম ইউরোপের কোনও এক জায়গায় রয়েছি''। এগুলি চাটুকারিতা বলে ভাবলে ভুল হবে। ২০০২-এর পর ২০০৭ 'মৌত কা সওদাগর' থেকে 'আতঙ্কের ভোট' সব কিছু ভেঙে মোদী আজ 'বিকাশ পুরুষ'-এর আখ্যা পেয়েছেন।

ইন্ডিয়া টুডের সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে— (১) শতকরা ৫৬ জন ভারতবাসী মোদীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান। (২) রাহুল গান্ধী, নীতিশ কুমার আর তাঁর মধ্যে পছন্দটা এরকম— ৫৬ শতাংশ মোদী, ৩৫ শতাংশ রাহুল, ২ শতাংশ নীতিশ। (৩) মোদীর সব সেরা সাফল্যের মধ্যে শতকরা ৪৩ জন বলেছেন— উন্নয়ন। (৪) গুজরাটের শিল্পায়নে মানুষ চাকরী পেয়েছে এটা মেনে নিয়েছেন শতকরা ৬৭ জন। (৫) দিল্লীর মনমোহন সিংকে গরিষ্ঠাংশ মানুষ অবক্ষয়ের প্রতীক হিসেবে দেখছেন, যেখানে মোদীর উন্নয়নের জ্বলজ্বলে মূর্তি।

সমীক্ষায় চাঞ্চল্যকর তথ্যে উঠে এসেছে আন্তর্জাতিক মিডিয়া জগতে তিনি সম্ভ্রমের সঙ্গে বিবেচিত নাম। বহু বিশ্বখ্যাত পত্রিকার প্রথম পাতায় তাঁর ছবি শোভা পাচ্ছে। লেখা হচ্ছে সম্পাদকীয়। খবরে আরও প্রকাশ ২০০২ থেকে বৃটিশ হাইকমিশনের কাছে ব্রাত্য মোদীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের পর তারা অবিশ্বাস্য ঘোষণা করেছে। —Vibrant Gujrat is in Britains national interest.

সবশেষে আসন্ন নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে ইন্ডিয়া টুডের আগাম সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস এক বিলুপ্ত প্রজাতি হতে চলেছে। গুজরাটের ১৮২টি বিধানসভা আসনের মধ্যে বিজেপি ২০০৭-এর ১১৭ থেকে বেড়ে ১২৮টি আসন পেতে পারে। কংগ্রেসের ঝুলিতে ৫৯ থেকে ঝরে পড়ে ৪৮। বিজেপির ভোট শেয়ার ডি লিমিটেশনের টেকনিকাল কারণে ২০০৭ এর ৪৯ শতাংশ থেকে ৪৭ নেমে এলেও কংগ্রেসের ৪০ শতাংশের মোকাবিলায় কোনও হেরফের হবে না। এমনটাই আগাম সমীক্ষাবাণী।

With Best
Compliments From

R. J. Films Pvt Ltd

85, N.S. Road
3rd floor
Kolkata - 700001

Lotus Rang Udyog

DEALS IN - DYES & CHEMICALS

26/4-A, Armenian Street.
Kolkata - 700 001

Phone : (O) 2268-9552,
2268-2717, 2218-2931
E-mail : rangjeet.Lunia@yahoo.in

শুভ দীপাবলীর প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ—

—চন্দ্রাণী কমপ্লিমেন্টস্ অ্যাণ্ড
এক্সপোর্ট লিমিটেড

Barakar Refractories
Private Limited

Works & Regd. Office

Near Ex-Hume Pipe Factory– Begunia, Barakar - 713324,

Burdwan, West Bengal

Phone : (0341) 520471 (Works)

(3041) 520136, 522147 (Resi.), Fax : (0341) 521679

‘ফিসচুলা, পাইলস্ থেকে বিনা রক্তপাতে চিরমুক্তি’

পায়ুদ্বারের ভেতরে বা বাইরের নানা শিরা উপশিরায় জ্বালাময়, যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিই হলো পাইলস্।

পায়ুদ্বারের পাশে হওয়া গর্ত থেকে পুঁজ, গ্যাস, রক্ত বা বায়ু ইত্যাদি নির্গত হলে তা হলো ফিসচুলা। এই সমস্ত রোগে রোগীরা এর ওর কথায় টোটকা ব্যবহার করেন। তাতে যন্ত্রণা বেড়েই চলে। ডাক্তারের কাছে গেলে উপদেশ দেন অপারেশনের। পুনঃ পুনঃ অপারেশনেও সারে না। কখনও কখনও সৃষ্টি হয় নতুন সমস্যা, অথচ আমাদের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি বিনা অপারেশনে যন্ত্রণাহীন চিকিৎসার পথ খুঁজে পেয়েছে অনেককাল আগেই। আয়ুর্বেদে ক্ষারসূত্র ও কেমিক্যাল কর্টারির সুনিপুন মিশ্রণে **জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার** তৈরি করেছে এক অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি। যার সফলতম প্রয়োগে পাইলস এবং ফিসচুলার যন্ত্রণাহীন কার্যকরী চিকিৎসা করা সম্ভব। এই জাতীয় চিকিৎসায় নামমাত্র কাটা ছেঁড়ার প্রয়োজন হয়। তাই রোগী চিকিৎসার পর পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরতে পারেন।

না এটা কোন হাতুড়ে অস্ত্রোপচার নয়, বিগত দশ বছর ধরে যে পদ্ধতিতে এখানে শত শত রোগী চিরতরে সুস্থ হয়েছেন সেই পদ্ধতি জাপানে তোয়ামা মেডিক্যাল কলেজ এবং নেপালে ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটির চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরীক্ষিত এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা (WHO) স্বীকৃত দিল্লীর AIIMS ও চণ্ডীগড়ের P.G.I. তেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

কি কি চিকিৎসা হয় এই পদ্ধতিতে?

প্রোলাপ্স পাইলস্, ফিসচুলা, ব্লিডিং পাইলস, পাইলোনিডাল সাইনাস, রেক্টোভ্যাজাইনাল ফিসচুলা, ফিসার সবকিছুরই চিরতরে মুক্তি ঘটে।

জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার

হাকিমপাড়া, হরেন মুখার্জী রোড, G.T.S. ক্লাবের নিকটে জর্জ ইনস্টিটিউট বিল্ডিং, শিলিগুড়ি

ডাঃ এস জে কর, মোবাইল নং-9434877734

—ঃ এখানে রোগীদের দেখার সময় ঃ—

সোমবার থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২.৩০টা পর্যন্ত এবং বিকেল ৫ টা থেকে ৮টা পর্যন্ত।

ও শনিবার ঃ বিকেল ৫ টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

SHREE NURSING TIMBER & ELECTRIC STORES

PODDAR COURT

18, RABINDRA SARANI, GATE NO. 4, 2ND FLOOR, ROOM NO. 7 & 8, KOLKATA - 700 001

PHONE : 2235-5210, 2235-2109, FAX : 91-33-2225-3373

e-mail : sntescal@yahoo.com, **SMART - 2386**

সুন্দরবন ভ্রমণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

বনভূমি

ট্রাভেলস্

লাক্সারী টুরিষ্ট
ও
মিনি লঞ্চে ভ্রমণ করুন

—ঃ যোগাযোগ ঃ—

মৃগাঙ্ক রায়
ক্যানিং টাউন,
দক্ষিণ ২৪ পরগণা

মোবাইল নং
৯৭৩৪২০৬০৪০

ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে
"চিকিৎসার জন্য দূরত্ব কোনও ব্যাপারই নয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ব্যধিমুক্তি"—রীণা দেবনাথ

সুদূর হুগলী জেলার কোন্নগরের এক গৃহবধূ—রীণা দেবনাথ। বছর ৪০-এর রীণা দেবী মারাত্মক চর্মরোগের শিকার হয়েছিলেন। খুবই কষ্ট পেতেন। সারা শরীর ফুলে ফুলে যেত, প্রচণ্ড চুলকাতো। রাতে ঘুমাতে পারতেন না। এভাবেই কষ্টের মধ্যে তাঁর দিন কাটছিল। হঠাৎ-ই রীণা দেবী তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর কাছে বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের নাম শুনলেন। জটিল এ্যালার্জী রোগী রীণা দেবী বিস্তারিত সব জেনে ২/১ দিনের মধ্যে চলে এলেন—হুগলীর কোন্নগর থেকে উত্তর ২৪ পরগণা মণ্ডলপাড়ায় ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে। রোগ যন্ত্রণায় বিব্রত ও দিশাহারা রীণা দেবনাথ হুগলী ও উত্তর ২৪ পরগণার দূরত্ব ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে মূল ব্যাপার ছিল রোগমুক্তি এবং এজন্য তিনি যে কোনও রকম কষ্ট স্বীকার করতে রাজী ছিলেন। যাই হোক— রীণা দেবী ডাঃ মন্ডলকে তাঁর রোগের সবিস্তৃত বর্ণনা দিলেন ও ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডল, অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে সবকিছু শুনলেন এবং সেদিন থেকেই শুরু হলো—রীণা দেবীর চিকিৎসা। রীণা দেবীও আস্থা ও ধৈর্য নিয়ে ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সুস্থ হবার দিকে এগোতে লাগলেন। সামান্য কয়েক মাসের চিকিৎসায় কোন্নগরের গৃহবধূ রীণা দেবনাথ আজ সুস্থ ও ভালো আছেন। দূর-দূরান্তে এমনও অনেক কঠিন ও জটিল রোগাক্রান্তরা আছেন যাঁরা মনে ভাবেন যে, ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের হোমিও চেম্বার অনেক দূরে কিন্তু কোন্নগরের রীণা দেবনাথ, এটা দেখিয়ে দিলেন যে, রোগ থেকে মুক্তি পেতে গেলে দূরত্বটা কখনই বড় ব্যাপার হতে পারে না।

রীণা দেবীর মাধ্যমে কোন্নগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের একটা ব্যাপক প্রচার হয়েছে। এবং পরিচিত, অপরিচিত অনেকের কাছেই তিনি ডাঃ মন্ডলের অসাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলেন ও ডাঃ তরুণ মন্ডলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আজ রীণা দেবী। *উপকৃত রোগী কর্তৃক প্রচারিত।*

যোগাযোগ ঃ হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট সেন্টার ফর ক্রনিক ডিজিস

"ডাঃ তরুণ কুমার মণ্ডল—

B.H.M.S. (Cal.),FW.T., P.E.T."

কনসালট্যান্ট হোমিওপাথিক চিকিৎসক, অথরাইজড ডক্টর অফ নির্মল হেলথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

চেম্বার ঃ চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা–
(সোম, শুক্র ও শনি সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা এবং প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা)।

বারাসত ঃ হৃদয়পুর, কলকাতা-১২৭—(মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবার—সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা)।

দেখানোর জন্য আগে নাম বুকিং করতে হবে।

মো ঃ ৯৩৭৮৩৮৫৬৬৬ / ৯৪৩৩৬৬০৯৩৬

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
12 November - 2012